ইংরাজ জুরী নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ৯ই জুন প্রাতঃকালে ৭ টার সময় বিচার আরম্ভ হয় *। খাল্‌সা সেরেস্তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার ইলিয়ট সাহেব এই মোকদ্দমায় দ্বিভাষী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে নন্দকুমারের কাউন্সেল ফারার সাহেব এই বলিয়া আপত্তি উপস্থিত করেন যে, নন্দকুমারের শত্রুদিগের সহিত ইলিয়ট সাহেবের মিত্রতা জন্মিয়াছে। আদালত এই আবেদনটিও অগ্রাহ্য করেন। অবশেষে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পরে, জ্যাক্‌সন্‌ নামে এক ইংরাজকে ইলিয়টের সহযোগী করিয়া দুই জন দ্বিভাষী দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইলিয়ট সাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংশের একজন বন্ধু এবং ইলিজা ইম্পের সহিত একত্রে এক কুঠীতে বাস করিতেন। ইম্পে সাহেব ইহাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। † ইলিয়ট নিজের ইচ্ছামতে দ্বিভাষী কর্ম্মের জন্য আবেদন করেন। ইহাতেই মোকদ্দমার ষড়যন্ত্রের সূত্রটি কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, পাঠক পাঠিকারা তাহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

নন্দকুমারের মোকদ্দমায় দ্বিতীয় জর্জের বিধিবদ্ধ আইনগুলি প্রযোজিত হইয়াছিল। ঐ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ ধারা মতে বিচার আরম্ভ হয়। এই আইন কেবল ইংলণ্ড ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশে কখনও প্রযোজিত হয় নাই, স্কটলণ্ড ও আমেরিকাতেও এতদনুসারে কখনও কোন মোকদ্দমার বিচার হইতে দেখা যায় নাই। স্যার রবর্ট চেম্বার্শ নামে এক বিচারপতি এই আইনটি উঠাইয়া রাজ্ঞী এলিজাবেথের ৫ম আইনমতে নন্দকুমারের বিচার করিতে বলেন। অবশেষে, দ্বিতীয় জর্জের আইন মতেই বিচার হয়। টলফ্রী নামে একজন লেখক্‌ লিখিয়াছেন, "স্পষ্টতঃ বলিতে গেলে কোনও আইন মতেই নন্দকুমারের বিচার হয় নাই; তৎকালীন প্রধান বিচারপতি লিমেষ্টার সাহেবের গৃহ-প্রস্তুত আইনমতে এই মোকদ্দমার বিচার হইয়াছিল।"

বিচারের প্রথমে গবর্ণমেণ্টের উকিল বলিলেন, "মহারাজা নন্দকুমার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে অস্ত্র, শস্ত্র ও বল প্রয়োগ পূর্ব্বক বলাকী দাস নামে এক ব্যক্তির দ্বারা এক খানি তমসুক জাল করাইয়া লইয়াছেন; ঐ তমসুকে মহারাজা নন্দকুমার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলাকী দাসের অভিমতি ও অনুমতির বিরুদ্ধে তাঁহার (বলাকীর)

* তৎকালে প্রাতঃকালেই সুপ্রীম কোর্টের মজলিশ বসিত। ইলিজা ইম্পে বলিয়াছেন, তিনি কেবল ৯ই জুন তারিখে বিচারালয়ে গিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দিনে (এই বিচারের সময়ে) যান নাই।

† কলিকাতা, রিবিউ, ২৮২ পৃষ্ঠা।

মোহরাঙ্কিত করাইয়া লইয়াছেন; ঐ তমসুক দ্বারা বলাকী দাসকে ৪৮,০৭১ টাকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা এবং শতকরা চারি আনা হিসাবে ঐ টাকার সুদ হইতে বলাকী দাসকে বঞ্চিত করা নন্দকুমারের দূষিত অভিপ্রায় ছিল।” মোকদ্দমার বিবরণ এই যে রঘুনাথ নামে এক ব্যক্তি বলাকী দাসের নিকট (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) ১১৬৫ সালে নন্দকুমারের নামে কতকগুলি মূল্যবান অলঙ্কার (বিক্রয়ার্থ) গচ্ছিত রাখিলেন। মীর কাসীমের পতন হইলে, বলাকী দাসের সমুদায় সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল অলঙ্কারও নষ্ট হইয়া যায়।

১১৭২ সালে (১৭৬৫ খৃঃঅব্দে) নন্দকুমার তাঁহার অলঙ্কারাদি ফিরাইয়া চাহেন, কিন্তু বলাকী তাহা দিতে অক্ষম। বলাকী বলিলেন, লুণ্ঠনের সময়ে তাহার কুঠি হইতে দুই লক্ষ টাকা অপহৃত হয়, ঐ টাকা এক্ষণে কোম্পানীর ঢাকাস্থ কোষাগারে নীত হইয়াছে; যদি বলাকী ঐ দুই লক্ষ টাকা ফিরিয়া প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে নন্দকুমারকে তিনি (বলাকী দাস) সুদ সহ ৪৮,০২১ টাকা দিতে স্বীকৃত আছেন। এই মর্ম্মে যে রসিদ লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে ১১৭২ সালের ৭ই ভাদ্র (১৭৬৫ খৃঃ অঃ ২০এ আগষ্ট) তারিখের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নন্দকুমারের মোকদ্দমার প্রধান ও প্রথম সাক্ষীর নাম মোহন প্রসাদ। ইনি বলাকী দাসের সম্পত্তির ম্যানেজার গঙ্গা বিষ্ণুর মোক্তার ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রেমকীর্ত্তি।

জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যখন কোন দেশকে নানা প্রকার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখনি এক এক জন মহাত্মা আপনার জীবন দান করিয়া ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখান—প্রেমময় মহেশের প্রেমের জয় ঘোষণা করেন।

অত্যাচারী দ্বিতীয় জেম্‌সের রাজত্বের সময় ইংলণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। উচ্ছৃঙ্খলতা অন্যায় ও অত্যাচার রাজার সহচররূপে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। শোণিত-পিপাসু বিচারকদ্বয়—যেফ্রিস্ ও জোন্স (যাহাদের নামে আজও ঘৃণার উদ্রেক হয়) রাজার হস্তের শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ছিল। রাজ্যমধ্যে চতুর্দ্দিকেই শোণিতপাত—নির্দ্দোষীর হৃদয়ের রক্তে ইংলণ্ডের ভূমি সিক্ত। ন্যায়ের নামে অন্যায়, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, বিচারের নামে অত্যাচার হইত। নিষ্ঠুর যেফ্রিস্ প্রধান বিচারাসনে অধিরোহণ

করিয়া শোণিতপায়ীর বীভৎস আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কোন প্রকার পৈশাচিক কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। তাহাদের প্রকোপে রাজ্য হইতে শান্তি, সুখ ও ন্যায় পলায়ন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই অমানিশার বিভীষিকাময় লোমহর্ষণ দৃশ্যের মধ্যেও সুন্দর চরিত্র ছবির অভাব ছিল না। এস্থলে তাহারই একটি চিত্র অঙ্কিত হইতেছে।

একদিন টাইবরণবাসিগণ দেখিয়া চমকিত হইল যে একটী রমণী তাহার অসামান্য দয়া ও সহৃদয়তার পুরস্কার স্বরূপ চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বকালে এই রমণীর পূর্ব্বে আর কাহারও জীবন্ত দাহনের দণ্ডাজ্ঞা হয় নাই। প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে কেহ চিতার নিকট যাইতে সাহস করিতেছে না অথচ রমণী প্রশান্ত ভাবে তাহাতে দণ্ডায়মান হইয়া দহনযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এই ভীষণসৌন্দর্য্যের ছবি দেখিয়া কাহার প্রাণ না ভয়ে স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়?

এই রমণী কে?—এলিজবেথ গণ্ট; —উইলিয়ম গণ্ট নামক এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রী। ইনি বাপ্টিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন নাই—অতুল সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে বর্দ্ধিত হন নাই, কিন্তু রমণী-প্রকৃতি-সুলভ সহৃদয়তা ও পরদুঃখ-কাতরতা তাঁহার হৃদয়ে সম্যক বিকসিত হইয়াছিল। বিনয় ও উদারতা তাঁহার ভূষণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত—তাঁহার সমব্যথী হৃদয় পরের অশ্রুজল মুছিতে ব্যাকুল হইত।

ইনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে কারাগার পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং তথায় বন্দীদিগের দুঃখভার লাঘবের প্রয়াস পাইতেন। রাজার অত্যাচার নিবন্ধন অথবা বিবেকের আদেশে ধর্ম্মগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা বন্দী হইত, তাহাদের প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইত। তিনি ধনী না হইলেও নিরাশ্রয় দীন দরিদ্র তাঁহার দ্বারে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইত না।

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল হইতেই ইংলণ্ডে উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল। নানা প্রকার দৈব-দুর্ব্বিপাকে ইংলণ্ডের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ানক মহামারীতে লণ্ডন নগর জনশূন্য হয়। নগরের প্রাসাদ সকল পরিত্যক্ত,—রাজপথ জঙ্গলে আচ্ছাদিত—সমস্ত নগর মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া শ্মশান দৃশ্যে পরিণত হয়। এই মহামারীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার পাইতে না পাইতেই আবার প্রচণ্ড, সর্ব্বভুক্ অগ্নি করাল জিহ্বা প্রসারণ করিয়া লণ্ডন সহরকে ধ্বংস করিল—ত্রয়োদশ সহস্রেরও অধিক গৃহ ভস্মে পরিণত হইল। ওদিকে আবার রাজ্যে

নানা প্রকার গৃহবিচ্ছেদ—নানা প্রকার অসন্তোষের কারণ ছিল। এক দলের ইচ্ছা ছিল যে ডিউক্ অব মন্মাউথ রাজার উত্তরাধিকারী হন। অপর এক দলের ইচ্ছা যে রাজার ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস্ তাঁহাদের রাজা হন। এই দুই দলে বিসম্বাদ চলিল; অবশেষে প্রথম দলের কয়েকজন চক্রান্ত করিল যে একদিন হঠাৎ পথে রাজার গাড়ি আক্রমণ করিয়া রাজা ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়কে হত্যা করিবে।

তাহাদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, কুচক্রীদিগের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। জেমস বার্টন নামক এক ব্যক্তি এই চক্রান্তস্থলে উপস্থিত ছিল এবং এই হত্যাকাণ্ডে যদিও তাহার অমত ছিল, তথাপি বিদ্রোহের অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বার্টন প্রাণভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তাহাকে কেহ ধরিয়া দিতে পারিলে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে এই রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। বার্টন কিছুকাল ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে কোমলহৃদয়া এলিজাবেথ গণ্টের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এলিজাবেথের অবারিত গৃহে কয়েক মাস নিরাপদে যাপন করিল;—পরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী পাইয়া তদ্দ্বারা নদী বাহিয়া গিয়া এক জাহাজে পৌঁছিল এবং সেই জাহাজে করিয়া হলাণ্ড যাত্রা করিল। যাইবার কালে তাহার পাথেয় জন্য এলিজাবেথ তাহার হস্তে পঞ্চাশটি মুদ্রা প্রদান করিলেন। দুই বৎসর কাল হলাণ্ডে থাকিয়া এই হতভাগ্য পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিল এবং সেজমুর সমরে দ্বিতীয় জেম্সের বিপক্ষে যুদ্ধ করিল। যুদ্ধ অবসানের প্রায় সপ্তাহত্রয় পরে বার্টন লণ্ডনে পলায়ন করিয়া আর এক ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিল। এইরূপে বিপদ রাশির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে মস্তক রাখিবার স্থান পাইয়া আশ্রয়দাতাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞভরে অবনত হওয়া দূরে থাকুক, জঘন্যমতি বার্টন তাহাদেরই সর্ব্বনাশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। বার্টন জানিত যে বিদ্রোহী অপেক্ষা বিদ্রোহিরক্ষকদিগের প্রতিই রাজার ক্রোধ অধিক। রাজাও প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিয়াছিলেন যে বিদ্রোহীকে আশ্রয় দান করাকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ মনে করেন—এবং এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

জীবন-তৃষ্ণা ও অর্থলোভ এই দুইটি প্রলোভন বার্টনের হৃদয়ের সদ্ভাবগুলির সহিত ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করিল। বার্টনের হৃদয় হারিল, সে স্বয়ং রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল—আপনার পরিচয় দিল—এবং বিদ্রোহীকে রক্ষার অপরাধে আপন আশ্রয়দাতাদিগের নামে অভিযোগ করিল। রাজদ্বার হইতে অনতিবিলম্বেই শমন বাহির হইয়া তাঁহারা বন্দী হইলেন।

১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ এ অক্টোবর সোমবার দিবসে প্রধান বিচারক জোন্সের নিকট এলিজাবেথের বিচার হইল। জুরিগণ সকলে উপস্থিত হইলে পর নিয়মিত সময়ে বিচার আরম্ভ হইল। বার্টন যত জনকে সাক্ষী দিবার জন্য আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনেরও সাক্ষ্যে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না যে এলিজাবেথ, বার্টনকে বিদ্রোহী বলিয়া জানিতেন; বরং বার্টন নিজমুখে স্বীকার করিয়াছে যে তাহার বিদ্রোহিতা সম্বন্ধে এলিজাবেথের সহিত কখনও কোন কথা হয় নাই। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে এলিজাবেথ তাঁহার বিশ্বজনীন দয়ার ভাবে প্রণোদিত হইয়া বার্টনকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও তিনি যখন রাজার কোপে পড়িয়াছেন, তখন আর ন্যায়-বিচারের আশা নাই। দয়ালেশশূন্য বিচারপতি তাঁহাকে দোষী স্থির করিলেন—এবং তাঁহার প্রতি জীবন্ত দাহনের দণ্ডাজ্ঞা দিলেন।

তিন দিবস অতিবাহিত হইল, আজ ২২ এ অক্টোবর—মর্ত্ত্যে আজ এলিজাবেথের শেষ দিন—তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল—যাঁহার আদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশে আবার ফিরিয়া চলিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকের স্তব্ধ জনতার মধ্য দিয়া—নীরবে—প্রশান্ত বদনে চিতার নিকট উপনীত হইলেন—বীর রমণী নিজ হস্তে আপনার চতুর্দ্দিকে চিতার ইন্ধন সাজাইলেন—এ দৃশ্য দেখিয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। চিতা ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল—রমণী চির বিশ্রামের জন্য চক্ষু দুটি মুদিলেন—মুখে স্বর্গীয় আলোকের ছায়া প্রতিফলিত হইল;—প্রেমের জয় হইল, স্বর্গের দেবতাগণ তাহার সাক্ষী রহিলেন।

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

কিবা সুখের সংসার,
পবিত্র প্রণয়ে বদ্ধ প্রেম পরিবার।
মাতা পিতা বন্ধু ভাই, মিলি যথা এক ঠাঁই,
ভক্তিভরে পূজে নিত্য সত্য সারাৎসার;
ক্ষুধিত তৃষিত জন, অন্নজলে তুষ্ট মন,
নিত্য হয় দান ব্রত অতিথি-সৎকার।
নাহি কলহ বিবাদ, হিংসা দ্বেষ পরিবাদ,
ক্ষমা শান্তি শোভে যথা দিব্য অলঙ্কার;
প্রেমে বিগলিত চিত, পর দুখে বিষাদিত,
পর সুখে হয় প্রাণে আনন্দ অপার।
সম্পদে বিপদে ধীর, ইন্দ্রিয় দমনে বীর,
ঈশ্বরের ইচ্ছা করি জীবনের সার,
তাঁহাতে সঁপিয়া মন, নরনারী অনুক্ষণ,
সাধয় সংসার ধর্ম্ম—প্রেমের ব্যাপার।

মরিসস ও কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশন।

মরিসস যাইতে হইলে সকল জাহাজকেই রাউণ্ড আইল্যাণ্ড নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের নিকট থামাইতে হয়। এই স্থান পোর্টলুই হইতে ১৪।১৫ ক্রোশ দূর। এখানে একটী সিগ্‌ন্যাল ষ্টেশন* আছে। এই স্থলের কর্ম্মচারীরা প্রথমে জাহাজের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। পরে আরোহিগণের শারীরিক অবস্থা এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন সংক্রামক পীড়া পথিমধ্যে হইয়াছিল কি না বা ঐ সময়ে কেহ উক্ত রোগাক্রান্ত আছেন কি না, এই সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লয়। যদি বসন্ত, বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া পথিমধ্যে আরোহীদের ভিতর কাহার না হইয়া থাকে বা বর্ত্তমানে দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাহাজকে পোর্টলুই বা মরিসস রাজধানীতে যাইবার অনুমতি দিয়া পোর্ট অফিসকে তার-যোগে সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি উল্লিখিত রোগ হইয়া থাকে বা তখনও উপস্থিত থাকে, তবে জাহাজকে এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়। পরে কোয়ারিণ্টাইন সভা, আরোহিগণকে যে স্থলে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং যত দিন সেই জাহাজকে কোয়েরিণ্টাইনে থাকিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া সংবাদ দেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, রাউণ্ড আইল্যাণ্ডের কর্ম্মচারিগণের সহিত জাহাজের লোকদিগকে সঙ্কেতে কথোপকথন করিতে হয়।

রাউণ্ড আইল্যাণ্ড হইতে পোর্টলুইয়ে আসিবার অনুমতি পাইলেও, জাহাজ একেবারে পোর্টলুই বন্দরে লাগিতে পারে না। রাজধানীর ২ ক্রোশ দূরে "বেলবয়" নামক একটী বৃহৎ বয়ার উত্তরাংশে সমুদ্রাভিমুখে অপেক্ষা করিতে হয়। সমুদ্রের এই অংশের নাম কোয়ারেণ্টিন গ্রাউণ্ড। জাহাজকে এই স্থানে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হয়। যে জাহাজের উপর যত দিন কোয়ারেণ্টিন স্থাপিত হয়, তাহা এই স্থলে থাকিয়াই ক্ষেপণ করিতে হয়। যে জাহাজে বসন্ত বা বিসূচিকা হইয়াছে, তাহার শেষ রোগীর আরোগ্যকাল হইতে (২১—৪০) দিন পর্য্যন্ত তাহাকে এখানে থাকিতে হয়। আরোহিগণের কথা দূরে থাকুক, সেই জাহাজের কোন দ্রব্যও স্থল-ভাগ স্পর্শ করিতে পায় না। এই অবসরে যদি আরোহীদের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয়, তবে তাহার আরোগ্যকাল হইতে আবার (২১—৪০) দিন পর্যান্ত ঐ স্থানে থাকিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি এইরূপ বিড়ম্বনায় পড়িয়া, এক খানি জাহাজ চারি মাস কাল এখানে ছিল। কোন কোন জাহাজ এইরূপ অবস্থায় অন্য দেশে চলিয়া যায়। কিন্তু মরিসসে মাল নাবাইবার প্রয়োজন হইলে অগত্যা জাহাজকে এখানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। ইহা যে কি দারুণ যন্ত্রণা তাহা উক্ত জাহাজবাসীরাই অনুভব করিতে পারেন। বিনা অপরাধে কঠিন মানসিক শ্রমের সহিত কারাবাস যদি কখন কাহারও হইয়া থাকে, তবে তাহা এই। আমরা

* কোন কোন সিগ্‌ন্যাল ষ্টেশনে বাতিঘর আছে। সকল সিগন্যাল ষ্টেশন বাতিঘর নহে।

তিন বার মরিসস গিয়াছিলাম। এক বার ১৫ দিন আর দুই বার সাত দিন করিয়া এইরূপ. অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

আহারীয় দ্রব্য বা অন্য কোন সমাগ্রী প্রয়োজন হইলে স্থলে জাহাজের যে কর্ত্তৃপক্ষ থাকেন, তিনি পাঠাইতে পারেন। কিন্তু যাহারা নৌকা করিয়া উক্ত দ্রব্য লইয়া আসিবে, তাহাদের বা সেই নৌকার সহিত জাহাজের কোন সংস্পর্শ হইতে পারিবে না। জাহাজের দুটী নৌকা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে হয়। একটী নৌকায় সমস্ত দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া উহারা প্রস্থান করে, পরে অন্য নৌকাটীতে যাইয়া উক্ত নৌকাকে ধরিয়া আনিতে হয়।

যদি আরোহীর সংখ্যা অধিক থাকে, তাহাদিগের এই দীর্ঘকাল এইরূপ সংকীর্ণ স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার ক্লেশ দূর করিবার মানসে সৌভাগ্য-ক্রমে মরিসস গবর্ণমেণ্ট একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেই উপায়ের ফলই কোয়েরেণ্টিন ষ্টেসন। এইরূপ স্থান দুইটী আছে—একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ, পোর্টলুই হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে; অপরটী দ্বীপেরই উত্তরাংশের অল্প ভূমিখণ্ড মাত্র। বেশি দিনের কোয়ারেণ্টিন বা রোগী হইলে আরোহীদিগকে ইহার কোন একটী স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, পরে জাহাজ সুস্থ কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া পোর্টলুইয়ের কোয়ারাণ্টিন ভূমিতে থাকে। এই নিয়মটী থাকায় আরোহীরা কিয়ৎ পরিমাণে হাত পা ছাড়াইয়া সুস্থ হয় এবং জাহাজের অধিকারী-দিগকে অধিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, কেননা ঐরূপ স্থলে জাহাজের অধিক দিন কোয়ারেণ্টিনে থাকিবার অল্প সম্ভাবনা। জাহাজের পক্ষে কোয়ারেণ্টিনের যে নিয়ম, কোয়ারেণ্টিন ষ্টেসনে আরোহীদের পক্ষেও সেই নিয়ম। সুতরাং কখন কখন জাহাজের ন্যায় আরোহীদিগকে এখানে একাদি-ক্রমে ৩।৪ মাস থাকিতে হয়। ফ্ল্যাট আইল্যাণ্ড একটী পৃথক ক্ষুদ্র দ্বীপ, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে ৭০০। ৮০০ শত ফিট উচ্চ একটী পাহাড় আছে। সাগর-বক্ষ হইতে ইহার আপাদমস্তক দেখিলে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়—যেন এক গম্ভীর-মূর্ত্তি যোগী পুরুষ উন্নত মস্তকে সেই যোগেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। সংসারের নানাবিধ বিভীষিকার ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার যোগ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। পবন নানা স্বরে তাঁহার কর্ণে কতই কুমন্ত্রণা দিতেছে। কিন্তু সেই অটল-চিত্ত যোগিবর নিস্পন্দ ভাবে সমাধিস্থ আছেন, তাঁহার কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

এই দ্বীপটীকে একটী বালুকাময় মরুভূমি বলিয়া বোধ হয়। কয়েক বৎসর হইল, ছায়া-প্রদানকারী কতক-গুলি বৃক্ষ দ্বীপের ইতস্ততঃ রোপিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ অল্প-সংখ্যক বৃহৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুসজ্জিত কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহও আছে। বিসূচিকা বা বসন্ত রোগের জন্য যে সকল জাহাজের উপর কোয়ারেণ্টিন স্থাপিত হয়, তাহাদের আরোহিগণকে এই দ্বীপে নামিতে হয়।

আর একটী কোয়ারেণ্টিন ষ্টেশনের নাম ক্যানোনিয়ার্স পয়েণ্ট। এই স্থানটী মরিসসের সর্ব্বোত্তরাংশ। ইহা একটী সুরম্য উদ্যানের ন্যায়। ইহার আয়তন ন্যূনাধিক ১০০ বিঘা। ফ্ল্যাট আইল্যাণ্ডের

গৃহগুলির ন্যায় এখানকার গৃহ। বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল, জাম, বকুল ও ঝাউয়ের সংখ্যাই অধিক। নিদাঘে ইহাদের ছায়া উদ্যানবাসীদিগের গ্রীষ্মাতিশয্য অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া সুখের কারণ হইয়া থাকে। এখানে কোন পাহাড় নাই। ইহার তিন পার্শ্বে অনন্ত সাগর ধূ ধূ করিতেছে, বালুকাময় তটে উত্তাল তরঙ্গ নিয়ত উচ্চ শব্দ করিয়া প্রতিঘাত করিতেছে এবং কত সমুদ্রজাত প্রাণী উপকূলে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে নানাবর্ণের অতিসুন্দর শুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে দশ দিন ছিলাম। প্রতি দিন শুক্তি আহরণ করিতে একবার করিয়া তীরে যাইতাম। প্রবাল, স্পঞ্জ প্রভৃতি অন্য প্রাণীও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবার মানসে আমরা একদিন নামিয়াছিলাম, কিন্তু এক হাঁটু জলের অধিক দূর যাইতে সাহস হয় নাই। বীচিমালার সেই ভীষণ আকৃতি, কর্ণভেদী গর্জ্জন ও মহান আস্ফালন দেখিলে শুনিলে ও অনুভব করিলে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না, এমন লোক অতি অল্পই আছেন।

এই দুইটী স্থান মরিসস গবর্ণমেণ্ট দ্বারা রক্ষিত হয়। যে সকল জাহাজের আরোহীদের উপর কোয়ারেণ্টিন সংস্থাপিত হয়, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের আহার গবর্ণমেণ্ট যোগাইয়া থাকেন, এবং তজ্জন্য প্রথম শ্রেণীর নিকট দুই টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকট এক টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর নিকট আট আনা করিয়া প্রতি দিন লইয়া থাকেন। খাদ্য একরূপ চলনসই পাওয়া যায়। বৃষ্টির জলই পানার্থে ক্ষুদ্র লৌহার পুষ্করিণীতে ধরিয়া রাখা হয়। যখন জলের অনাটন হয়, তখন পোর্টলুই হইতে আনা হয়।

এখানকার কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন ভাণ্ডারী, একজন ডাক্তর যাহাকে Surgeon Superintendent of the Quarantine Station বলে, ২০ ৪০ টী সৈন্য এবং গুটিকত ভৃত্য। সার্জ্জনই এখানকার একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা, সকলেই তাঁহার অধীন। তিনি ইচ্ছা করিলে অপরাধীকে কয়েদও করিতে পারেন।

উদ্যানের বাহিরে ৪০০ হস্ত ভূমিখণ্ড মধ্যে বাহিরের লোক পদার্পণ করিতে পারে না, এবং উদ্যানের লোক ঐ সীমার বাহিরে যাইতে পারে না। যদি কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন করেন, প্রথমতঃ তাহাকে সৈন্যেরা নিবারণ করিবে। পরে না শুনিলে সার্জ্জনের অনুমতি পাইলে তাহাকে গুলি করিতে পারে।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফরীণ ফণ্ডে কুমার মহিমারঞ্জন রায় ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার লুই নেপোলিয়ন ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি গারো পর্ব্বতে হাতী ধরা দেখিতে গিয়াছেন।

৩। পেল মল গেজেট সম্পাদক ষ্টেড সাহেব কারাগারে গিয়াও বীরের ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখাইতেছেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তাঁহার বন্ধুগণ ৮০ হাজারের অধিক টাকা তুলিয়াছেন।

৪। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞীর সহিত ফরাসীদের যে যুদ্ধ অনেক দিন চলিতেছিল, তাহার শান্তি হইয়াছে। ফরাসীরা মাদাগাস্কার রাজকোষ হইতে ৪০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ লইয়া আর সকল দাবী দাওয়া পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়াছেন।

পুস্তক-প্রাপ্তি।

আমরা সময়াভাবে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি মাত্র স্বীকার করিলাম, পশ্চাৎ সমালোচনা করিব।

১। মায়াবিনী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত, মূল্য ৷৹ আনা।

২। পরেশ প্রসাদ—একজন পরিব্রাজক বিরচিত মূল্য ৷৷৹ আনা।

৩। মধু মালতী—সূর্য্যকুমার সোম প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ৶৹ আনা।

বামাগণের রচনা।

সূর্য্যোদয়।*

দেখ সূর্য্য উদয় হইয়াছেন। ইহাঁর শোভা এ সময় এরূপ বোধ হইতেছে যেন অন্ধকারকে জয় করিবার জন্য দিবস গোলা মারিয়াছে, অথবা প্রকাশের এ পিণ্ড, কিম্বা আকাশ সরোবরে একটি বড় লাল কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বা লোকেদের শুভাশুভ কর্ম্মরূপ রথের এ চক্র, অথবা কালের নির্লোপ হইবার শপথ করিবার এ তপ্ত লৌহ গোলা, কিম্বা এ এক লাল বেলুন যাহা সময়কে লইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, কিম্বা রাত্রিতে সুখিনী হয় ও দিবসে বিয়োগিনী হয় সেই রমণীদের বিয়োগাগ্নির এ কুণ্ড, বা পূর্ব্বদিগঙ্গনার মাণিক্যের চূড়ামণি কিম্বা কাল খেলাড়ীর এ লাল রঙ্গের ঘুড়ী, বা সময় রেলগাড়ীর আগমনসূচক সম্মুখের লাল লণ্ঠন কি শূন্যমার্গে জলন্ত এক লাল ঝাড় কিম্বা সেই বড় টাকশালের ইহাও এক মোহর যাহা চন্দ্রের

* প্রভাতে সূর্যোদয় দেখিয়া একটী রমণীর মনে কত আশ্চর্য্য ভাবোদয় হইতে পারে, এই রচনা তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। পাঠিকাগণের কৌতূহল উদ্দীপনের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

মহল টাকার অপেক্ষা মূল্যে ষোল গুণ অধিক, কিম্বা সময় চালানের পেটীর উপরে এ গালার মোহর, কিম্বা আকাশ-রূপী দিগম্বরের ভিক্ষা করিবার এ ভাবার বাটী, কিম্বা অন্ধকারে যুদ্ধ করিবার কাল বীরের এ রক্ত মাখা ঢাল, বা নিশা কামিনীর এ স্বর্ণের কর্ণফুল, কিম্বা তাহার লীলা কদম্ব, কিম্বা তাহার খেলিবার লাল রঙ্গের কন্দুক, কিম্বা শয়ন করিবার মখমলী গোল বালিস, কিম্বা তাহার কপালের লাল কাচের টীপ, কিম্বা জ্যোতিষী বুদ্ধির ঘোড়-দৌড়ের সীমা বিন্দু, কিম্বা সে কতই গণিল, কিন্তু কিছুই তাহার হাতে আসিল না, এ তাহারি শূন্যবিন্দু, কিম্বা ইহা একটা লাল পাতরের গুম্বজ, কিম্বা কাল দূতের মাথার এ গোল পাগড়ী, কিম্বা সেই বিচিত্র বালকের খেলিবার ইহাও একটা খেলনা, কিম্বা জগৎকে চেতন করিবার এ ঢাক, কিম্বা প্রাতঃ-কালের জনসমূহের মঙ্গল সূচক দিশা-বধূর আরক্ত করতল, কিম্বা সেই কর্ম্মকাণ্ডীর এ অগ্নিকুণ্ড, যাহাতে নিত্য তিনি জগতের আয়ু হোম করেন, কিম্বা সেই মঙ্গল মূর্ত্তির ইহা মঙ্গল আরতি, কিম্বা তাহার দরবারে গজাল দিবার ঘড়ী, কিম্বা লাল আয়না, কিম্বা স্বর্গ ভবনের এক গবাক্ষ, কিম্বা সেই রসিকের পানের ডাবা, কিম্বা আকাশ সরোবরের লাল কচ্ছপ, কিম্বা কিরণের জাল বিস্তার-কর্ত্তা কোন ধীবর, কিম্বা জগৎকে মৃগ-তৃষ্ণা ভ্রমের জাদুতে বদ্ধ করিবার ইন্দ্র-জালের পাঁটরা, কিম্বা সোপাস্বরাবাজের ইহাও একটি সুরথা লক্কা পায়রা, কিম্বা সে নিত্যবরের বরযাত্রার মশাল, কিম্বা মাথার টোপর, অথবা লোকেদের ভাল মন্দ কর্ম্মের লেখা লিখিবার লাল দোয়াত, কিম্বা বিধাতার দরবারের শিখরের কলস, কিম্বা সময়ের আঁচে জগৎকে পাকাইবার খোলাভাঁটী, কিম্বা সময়ের বনাতী চতুর্দ্দোল, কিম্বা সংসারের জল তোলবার ডোল, বা কাল কসাইয়ের দোকানের এ মাংসপিণ্ড, কিম্বা দিক্‌ কুঞ্জরের রঙ্গীন হোঁদা, কিম্বা কাল দেবের বেড়াইবার যান, কিম্বা কালের রক্ত নদীর এ ফেন, কিম্বা কাল সর্পের ফণা, কিম্বা আকাশ দর্পণে ভূগোলের প্রতিবিম্ব, কিম্বা খগোল পটে যে লক্ষ লক্ষ জহরৎ জ্বলিতেছে, তাহার এক ছোট লাল খণ্ড, কিম্বা কোন দেবাঙ্গনার স্বর্ণের তাম্রকুণ্ড, বা পূর্ব্ব দিশা সধবা রমণীর কপালের সিন্দুর কৌটা, কিম্বা তাহারি মুখের হাসি, কিম্বা সর্ব্বদা ফ্যাসান পরিবর্ত্তনকর্ত্তা কালের মাথার গোল টুপী, কিম্বা তাহারি জেব ঘড়ী, কিম্বা নীলের কবচে জড়িত একট মাণিক্য, কিম্বা গায়ত্রীর মূর্ত্তিমান মন্ত্র, কিম্বা নভের মুকুট, কিম্বা আলোকের খনি, কিম্বা জগৎ পিষিবার চাকী, কিম্বা কাল কাপালিকের অগ্নিময় কপাল, কিম্বা কাল নর্ত্তকের কাংশ করতাল, কিম্বা তাহার মদ্যপান করিবার বাটী, কিম্বা শীতভীতদিগের সুখদ ইহা একটা আঙ্গেঠী, কিম্বা চক্র সুদর্শন নত্র ফটো গ্রাফ কিম্বা সময় চালিবার চালনী, কিম্বা আকাশ-গুহা থেকে যে কেশরী উঁকি মারিতেছে তাহারই হাঁ, কিম্বা কাল পুরুষের আয়ু, ভোজন করিবার সুবর্ণের থালা, কিম্বা জগন্নিয়ন্তার পূজোপ-যোগী জবা কুসুমের ডালা, কিম্বা সেই বিরাট পুরুষের গলার রক্ত কিরণের মালা।

শ্রীমতী মল্লিকা দেবী—কাশী।

আত্মবিলাপ।

১

কোথা গো মরণ রাণী—
সে চাঁদ বদন খানি
আঁখি পুরি প্রাণ ভরি দেখি এক বার;

২

জীবন সমরাঙ্গনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপণে,
কইত হলনা পূর্ণ বাসনা আমার।

৩

কোথা দেবি বস এসে,
আমার অন্তর দেশে,
জুড়াই পার্থিব জ্বালা তোমার পরশে;

৪

দুঃখ রাশি অনুক্ষণ,
দহে মোর তনু মন,
নিবে না জীবন দীপ, আয়ু নাহি খসে।

৫

জলন্ত চিতার ন্যায়,
হৃদয় দহিয়ে যায়,
রাবণের চিতা, চিন্তা সদা দহে প্রাণে;

৬

কুহকিনী আশা কাছে,
আর কি লভিতে আছে,
কি সাধে ভুলিয়ে আর ধাই ওর পানে?

৭

ভোলা মন ফিরে যাও,
দিব রাত্তি কোথা ধাও,
কে তোরে ক্ষেপায় সদা ক্ষেপার মতন?

৮

জীবন রজনী তোর,
হয়ে এল ভোর ভোর,
কেন মিছে কিসে আর থাকিবি মগন?

৯

সুখ পথে যত যাই,
দেখ তার অন্ত নাই
মিলেনা সুখের দেখা কাঁদিয়ে বেড়াও;

১০

পতি পুত্র পরিবার,
কেউ নয় আপনার,
আমি যে আমার নই জান নাকি তাও?

১১

কে বলে মরণ রাণী,
ও চাঁদ বদন খানি,
কালীময় পাশে মাখা ধূসর বরণ?

১২

পার্থিব বাসনা পাশে
আছে যারা বাঁধা ফাঁসে,
কেন না দেখিবে তারা তোমায় ভীষণ!

১৩

হৃদি রাজ্যে এ আমার,
নাহি কিছু নাহি আর;
একে একে গেছে সব বাকিই মরণ,

১৪

কেন প্রাণ বোঝা বই?
কেন তবে গৃহে রই?
এ পোড়া হৃদয়ে মাতা একই রতন।

১৫

তাঁর ওই স্নেহ পাশ,
ছিঁড়িতে যায় না বাস,
তাই এ জীবনে এত বিষাদের ভার;

১৬

কাঁদিব না কাঁদাব না,
জ্বলিব না জ্বালাব না,
ওই বায়ু সাথে প্রাণ মিশাক আমার।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ মোহিনী সেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৩ সংখ্যা। মাঘ ১২৯২—ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্ম গোলযোগ—ব্রহ্মরাজ্যে এখনও বিদ্রোহ-শান্তি হয় নাই। দলে দলে ডাকাইতগণ ঘোর অত্যাচার করিতেছে। একটী মগ রাজকুমার বহু সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। ভামো প্রদেশ অধীনতা স্বীকার করে নাই। এই সকল গোলযোগ শান্তির উদ্দেশে লর্ড ডফরিণ দিল্লী হইতে আসিয়া সস্ত্রীক ব্রহ্মদেশদর্শনে যাইতেছেন।

ইনকম ট্যাক্স—ভারতবাসিগণ অনেক দিন এই কর দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু আবার ইহার জন্য প্রস্তুত হউন। এই করের যে বিল হইয়াছে, তাহাতে যাঁহাদের বার্ষিক আয় ৫০০ টাকার ন্যূন, তাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন। করের হার এইরূপ হইতেছেঃ—

৫০০	হইতে	৭৫০	টাকার কম আয়ে	১০৲
৭৫০	"	১০০০	"	১৫৲
১০০০	"	১২৫০	"	২০৲
১২৫০	"	১৫০০	"	২৫৲
১৫০০	"	১৭৫০	"	৩২৲
১৭৫০	"	২০০০	"	৪৫৲

২০০০ টাকা ও তাহার উর্দ্ধে টাকা প্রতি ৫ পাই হিসাবে ট্যাক্স ধরা হইবে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ১০টী রমণী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহঁাদের মধ্যে ৩ জন পারসী।

যমুনাবাই যোশী—এই মারহাট্টা

রমণী আগামী মার্চ্চ মাসে ফিলেডেল-ফিয়া নগরে 'এম ডি' পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্বেত হস্তীর মৃত্যু—ব্রহ্মদেশের শ্বেত হস্তীর রাজভোগের বিষয় বামা-বোধিনীর পাঠিকাগণ অবগত আছেন। রাজার ন্যায় ইহার রাজপ্রাসাদ, আফিস, ভৃত্য, সুবর্ণ ছত্র প্রভৃতি সকল সজ্জাই ছিল। ইংরাজহস্তে ব্রহ্ম পতিত হইলে শ্বেত হস্তীটীর ভালরূপ পরিচর্য্যা হয় নাই, তাহাতে তাহার আমাশয় পীড়া হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। মহতের অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মরাজ অপেক্ষা এই রাজহস্তী ভাগ্যবান্।

সীতা চরিত্র।

সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা ও রাজা রামচন্দ্রের মহিষী ছিলেন। এই স্বর্গীয়-স্বভাবা নারী যে গুণে পৃথিবীর নরনারী-কুলের আদর্শ-চরিত্র হইয়াছেন, সেই গুণের নাম সদ্ভাব। এক্ষণে সদ্ভাব কাহাকে বলে শুন। আমরা সকলেই এক প্রেমময় ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের সকলের হৃদয় এক প্রেমময় সূত্রে গ্রথিত; এইরূপ জ্ঞানকে সদ্ভাব বলে। এই সদ্ভাব হইতে মৈত্রী জন্মে। এ জগতে সকলেই আমরা আপনার, এইরূপ জ্ঞানের নাম মৈত্রী। এই মৈত্রী হইতে অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়। লোক সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান হইলে প্রলয়েও তাহার বিলয় নাই। সীতা সেই সদ্ভাব গুণে গুণবতী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি সকলকেই আপনার বলিয়া জানিতেন। তিনি পবিত্র চরিত্রের আদর্শরূপে ধ্রুবতারার ন্যায় অনন্ত কাল জগতে জাজ্জ্বল্যমান থাকিবেন।

তাঁহার পতি পিতৃসত্যপালনার্থে সর্ব্ব-ত্যাগী ও বনবাসী হইলে, তিনিও সর্ব্ব-ত্যাগিনী ও বনবাসিনী হইলেন, এবং ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইলেন। পথে অগ্নিময় নিদাঘ সূর্য্য তাঁহার মস্তক দগ্ধ করিলে তিনি অম্লান মুখে তাহা সহ্য করিতেন, সুতীব্র কণ্টক বা কঠোর প্রস্তর বজ্রবৎ তাঁহার পদে বিদ্ধ হইলে, তিনি অবলীলায় তাহা সহ্য করিতেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা অঙ্গের আভরণ করিয়া-ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহাকে 'সর্ব্বংসহা-নন্দিনী' বলিয়া থাকে। যিনি সকলি সহ্য করেন, সেই সর্ব্বজননী ধরণীর নাম 'সর্ব্বংসহা'; তাঁহার 'নন্দিনী' অর্থাৎ আনন্দময়ী কন্যা। সীতা সত্যই পৃথিবীর আনন্দময়ী কন্যা ছিলেন, তিনি পরমানন্দে সকলই সহ্য করিতেন।

সীতা একদা দুর্গম কান্তারে পতির অনুগমন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, আমার শ্বশুর-কুলপতি সূর্য্যদেব খরতর

করে মস্তক দগ্ধ করিতেছেন; আমার মাতা ধরণী যেন কণ্টকময়ী হইয়াছেন,—আমার প্রতি দয়ালেশ প্রকাশ করিতেছেন না; আমার প্রাণেশ্বরও ক্ষণকাল বিলম্ব সহিতেছেন না—জানিলাম অদৃষ্ট প্রতিকূল হইলে প্রাণের আত্মীয়ও প্রতিকূল হয়। অবস্থা চক্রের পরিবর্ত্তনে মনুষ্য হইতে রাক্ষস পর্য্যন্ত সকলেই সীতার প্রতিকূল। গৃহে শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতিকূলতায় তিনি বনবাসিনী; বনে রাক্ষসের প্রতিকূলতায় তিনি পতিবিরহিণী ও অশেষ-যন্ত্রণা ভাগিনী; অবশেষে পতির প্রতিকূলতায় তিনি, সকল দিক্ জাজ্বল্যমান থাকিতেও, পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছিলেন। জীবনের এরূপ কঠিন পরীক্ষায় কি কেহ কখনও পড়িয়াছেন, না পড়িবেন? কিন্তু তিনি অলৌকিক পবিত্রতার বলে সেই দুস্তর পরীক্ষাসাগর অবহেলে উত্তীর্ণ হইয়াগিয়াছেন। সকলে তাঁহার প্রতিকূল হইলেও তিনি কখনও কাহারও প্রতি প্রতিকূল হন নাই; তিনি অন্তঃকরণে সকলেরি মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। সকল অবস্থায় সকলের প্রতি সদাই অনুকূল ছিলেন। তিনি প্রবাসিত পতির সঙ্গে সঙ্গে এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিলে, এক বনের পশুপক্ষীরা তাঁহাকে না দেখিয়া আহার পরিহার করিয়া হাহাকার করিত, এবং অন্য বনের পশুপক্ষীরা তাঁহাকে দেখিয়া, শিশু যেমন অনেকক্ষণের পর মাতাকে পাইয়া আনন্দ করে, সেইরূপ আনন্দ করিত। তিনি যখন যে স্থানে যাইতেন, তাহা তখনি আনন্দকানন হইত, এবং যে স্থান পরিত্যাগ করিতেন, তাহা শ্মশানবৎ দুর্নিরীক্ষ্য হইত।

সীতার মনে শত্রু মিত্র বা বড় ছোট বলিয়া ভেদ ছিল না; তিনি সকলেরি ব্যথায় ব্যথিত হইতেন। একটী কৃমিকীটেরও কষ্ট দেখিলে দয়ায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তাঁহার সতীত্বের এরূপ প্রভাব ছিল যে তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত রাবণও সেই তেজোময় সতীত্বের নিকট সুদূরপরাহত হইয়াছিল। সীতার হৃদয় অপার প্রেমের আধার ছিল। অশোক বনে রাবণের আদেশে তাঁহার প্রতি যে সকল যন্ত্রণার অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছিল, যে সকল অস্ত্রের আঘাতে পাহাড় পর্ব্বতও চূর্ণ হয়, সে সকল বজ্রময় অস্ত্রকেও তিনি কোমল কুসুমমালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিভীষিকাময়ী লঙ্কায় যে সকল ভয়ঙ্করী রাক্ষসীবৃন্দ পরিবেষ্টিত ছিলেন, সেই রাক্ষসীরাই শেষে তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদে বিকাইল। তিনি সেই ভীষণ রাক্ষসপুরে বাস করিয়া বিষের মধ্যে অমৃত লাভ করিলেন। অতএব ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, সদ্ভাবের কোথাও শত্রু নাই, সদ্ভাবের রাজ্যে সকলেই মিত্র। মহাদেব যেরূপ কালসর্প লইয়া হৃদয়ের আভরণ করেন, সদ্ভাবময়ী সীতাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুকে

হৃদয়ের আভরণ করিতেন। "শীলেন সর্ব্বে বশাঃ"—চরিত্রে সকলেই বশীভূত হয়, তিনি এই সত্যটি জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সীতা পতিপ্রাণা ছিলেন; মাতা, পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী ছিলেন; ভ্রাতা, ভগিনী, দেবর ও ননন্দা প্রভৃতির প্রতি প্রেমময়ী ছিলেন; সন্তান ও দাস দাসী প্রভৃতি প্রতিপাল্যের প্রতি সদা স্নেহময়ী ছিলেন; প্রাণিমাত্রেরি প্রতি মৈত্রীময়ী ছিলেন; দুঃখিতের প্রতি দয়াময়ী ছিলেন। তিনি সার্ব্বভৌম রাজার মহিষীপদে অভিষিক্ত হইয়া, স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া পরিজনগণকে ভোজন করাইতেন। রামচন্দ্র অলীক লোকাপবাদে ক্ষুভিত হইয়া, বিনা দোষে সেই পূর্ণগর্ভা পতিব্রতাকে পরিত্যাগ করিলে, সেই পতিব্রতার বদন হইতে পতির প্রতি একটীও অপ্রিয় বাক্য নির্গত হয় নাই, তিনি আপনাকেই দুষ্কৃতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী জানিয়া, বারংবার আত্মনিন্দা করিয়াছিলেন এবং জন্ম জন্মান্তরে রামকেই পতিরূপে লাভ জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। পৃথ্বীশ্বরপত্নী যে সীতা পূর্ব্বরাত্রে কৈলাস সদৃশ প্রদীপ্ত রাজপ্রাসাদে শিবতুল্য পতির পার্শ্বে বিরাজ করিয়াছিলেন, পর দিনে সেই সীতা শরণার্থিনী হইয়া দরিদ্র বাল্মীকির পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সমাগমে জন্তুতা অরণ্যবাসী ও অরণ্যবাসিনীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতি প্রকাশিত হইল। তিনি বাল্মীকির কুটীরে বাস করিয়া সেই শান্তিময় পবিত্র আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন, তথায় সর্ব্ব প্রাণীর জননীরূপে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেচন কুম্ভ লইয়া সস্নেহে আশ্রমের চারা গাছ গুলিতে জল দিতেন, তখন তিনি অপত্য প্রসবের পূর্ব্বেই অপত্য পালনের আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি যখন প্রত্যূষে তমসার জলে অবগাহন করিয়া পুলিনে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে পূজা করিতেন, তখন যুগপৎ ঈশ্বরসেবা ও পতিসেবার সুখ অনুভব করিয়া অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তিনি বাল্মীকির সেই পুণ্যক্ষেত্রে নিত্য অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দুঃসহ পতিবিরহ বেদনা বিস্মৃত হইতেন। তিনি জলে স্নান করিতে নামিলে, জলচর পক্ষীরা তাঁহাকে বেড়িয়া আনন্দে রব করিত। তিনি ভিক্ষুককে অন্ন দিতে যাইলে পশুকুল তাঁহার হস্তের ভোজনপাত্র কাড়িয়া লইত। তিনি যজ্ঞীয় কুশ কাস ও ফল ফুল আহরণ করিলে তপোবন-মৃগেরা তাহা হরণ করিত। তিনি অতিথি সেবার জন্য নীবার চয়ন করিলে গগনচর পক্ষীরা আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে ও হস্তে বসিয়া তাহা আত্মসাৎ করিত। তিনি করতালি প্রদান করিলে বনের মাতঙ্গ, কুরঙ্গ,

বিহঙ্গ ও পতঙ্গ তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিত। বনের তরু, লতা, শিলা ও শৈবলিনীর মধ্যে কেহ তাঁহার ভাই, কেহ ভগিনী, কেহ সখা, কেহ সখী, কেহ পুত্র, কেহ বা কন্যা ছিল। এইরূপ জল স্থল ও আকাশ সকলি সীতার বন্ধুময়; চেতন অচেতন ও উদ্ভিদ সকলি সীতার বন্ধুময়।

যেরূপে সীতার ভৌতিক দেহের অবসান হয় তাহা ভাবিলে তাঁহাকে দেবতা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। রাম পতিপ্রাণা পত্নীকে বিসর্জ্জন করিয়া গোপনে নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন; রামচন্দ্র রাজা; প্রজা রঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম; এজন্য তিনি প্রজার বিরক্তিভয়ে ধর্ম্মপত্নীকে গৃহ হইতেই অন্তর করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হৃদয় হইতে অন্তর করেন নাই। ধীমান রামচন্দ্র সেই নিদারুণ সীতাশোক হৃদয়ে সম্বরণ করিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নে প্রজাগণকে সুখী করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং নির্লোভ ছিলেন, এজন্য প্রজারা সমৃদ্ধিশালী হইল; তিনি বিঘ্নভয় নিবারণ করিতেন, এজন্য প্রজারা ক্রিয়াবান হইল; তিনি পালন গুণে সকলের পিতা, এবং শোক শান্তি করিয়া সকলের পুত্র হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের সুখ সৌভাগ্য সাধনে মগ্ন হইলেন বটে, কিন্তু সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অবধি আর কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিলেন না। তিনি শোক শান্তির জন্য স্বর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করিয়া, মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রামের যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত সাধুগণের সমাগম হইল; মহা সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার দুইটি অমৃতকণ্ঠ শিশুকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় কুশ লব তথায় রামায়ণ গান করিতে লাগিল। একে রামের চরিত, তাহাতে বাল্মীকি তাহার কবি, তাহাতে আবার কিন্নরকণ্ঠ কুশ লব তাহার গায়ক; সমবেত লোক সকল একাগ্র-চিত্তে কুশ লবের সংগীত শ্রবণে নিমগ্ন হইল, সকল নেত্র হইতেই অশ্রুবারি গড়াইতে লাগিল, বোধ হইল যেন একটি বিশাল অরণ্যভূমি প্রভাতে নির্ব্বাত ও নিস্পন্দ হইয়া আছে, আর তাহার পত্রে পত্রে শিশির ঝরিতেছে।

অনন্তর, রাম মহর্ষি বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! এ শিশু দুইটি কাহার? ইহারা দেখিতেছি অবিকল আমারি প্রতিরূপ, প্রভেদ কেবল বয়সে ও বেশে। ইহা-দিগকে দেখিয়া স্নেহে আমার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইতেছে। তখন পরম কারুণিক বাল্মীকি কুশ লবের পরিচয় দিয়া কহিলেন,—বৎস! তোমার পবিত্রতা-ময়ী ধর্ম্মপত্নীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর, তোমার এই হৃদয়সর্ব্বস্ব তনয় দুইটিকে ক্রোড়ে কর, আমাদের সকলের

শোকশল্য মোচন কর। রাম কহিলেন, পিতঃ! আপনার পুত্রবধূকে আমি নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানি, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত রাবণের গৃহে বাস করায় তাঁহার চরিত্রে অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস নাই। জানকী অগ্রে আত্মচরিত্রে প্রজাগণের বিশ্বাস উৎপাদন করুন, পরে আমি আপনার আজ্ঞায় তাঁহাকে গ্রহণ করিব। রাম এইরূপ কহিলে, মহর্ষি শিষ্য পাঠাইয়া তপোবন হইতে সীতাকে আনাইলেন। পরদিনে রাম সমস্ত পৌরগণকে আহ্বান করিলেন, বাল্মীকিও যথাকালে সীতা ও কুশ লবকে লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। রক্তবস্ত্রে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টি সংলগ্ন, মূর্ত্তি প্রশান্ত, পবিত্র অথচ তেজোময়; বোধ হইল, সেই সভাঙ্গনে অরুণোদয় হইয়াছে। মহর্ষি আসন পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে আদেশ করিলেন,—বৎসে! তুমি তোমার পতির সমক্ষে আপন চরিত্র বিষয়ে লোকের সংশয় নিরাকৃত কর। তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির পাদপদ্মে নিবদ্ধ। তিনি পবিত্র জলে আচমন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই বাণী উচ্চারণ করিলেন;—"যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি, তবে মা বসুন্ধরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।" পরক্ষণেই জীবলোকে হাহাকার উঠিল, দৃষ্ট হইল, সীতা জীবলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপে জনককুলের ও রঘুকুলের মঙ্গলপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। নির্ব্বাণ হইল বটে, কিন্তু যতকাল জগতে চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবে, ততকাল 'সীতা' এই পবিত্র অক্ষর দুইটি মঙ্গল চরিত্রের আদর্শকে বুঝাইবে। সীতা পবিত্র দেবযজ্ঞে জন্মিয়াছিলেন, পবিত্র দেবযজ্ঞ করিয়াই চলিয়া গেলেন। বিশ্বপূজিতা বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী সীতাকে উদ্দেশ করিয়া সত্যই বলিয়াছিলেন;—"বৎসে! তুমি শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও, তোমাতে যে অলৌকিক পবিত্রতা আছে, তাহাতে তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। জগতে, কেহ তোমার বয়স, জাতি বা সম্বন্ধ ভাবিয়া পূজা করিবে না, তোমার গুণ ভাবিয়াই চিরকাল তোমার পূজা করিবে।"

নক্ষত্রপাত।

গত অগ্রহায়ণ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর হইতে আকাশে একটি অতি বিস্ময়কর দৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। বোধ করি পাঠিকাবর্গের মধ্যে অনেকে তাহা দেখিয়া থাকিবেন। সান্ধ্য অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইলে দেখা গেল যে

নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল স্খলিত হইয়া আকাশের এক অপূর্ব্ব শোভা উৎপাদন করিতেছে। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে প্রত্যহই এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মধ্যে মধ্যে স্খলিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু আমরা যে রাত্রির কথা বলিতেছি তাহার ব্যাপার স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে সেই অদ্ভুত দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন আকাশে এমন এক বিন্দু স্থান নাই যেখান হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে একটি না একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে না। আমাদের পার্শ্বে যাঁহারা দণ্ডায়মান ছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে আকাশে মধ্যে মধ্যে নক্ষত্রপাত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এমন বিস্ময়কর ব্যাপার কখনও দেখা যায় নাই। সেই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থগুলি যে নক্ষত্র বা তারকা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। শুধু তাঁহাদের কেন, অনেকেরই এইরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকিবে। অনেকেই আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া থাকেন 'ঐ দেখ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল'। কিন্তু আমরা রাত্রিকালে আকাশে তারকার ন্যায় যে সকল পদার্থ খসিয়া পড়িতে দেখি, সেগুলি বস্তুতই কি তারকা?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক যে নক্ষত্রগুলি কিরূপ পদার্থ। আমরা চর্ম্ম চক্ষুতে ত এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে তাহারা ক্ষুদ্র জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডের মত রাত্রিকালে আকাশকে ব্যাপিয়া থাকে। বাস্তবিক কি তাহারা এইরূপ ক্ষুদ্র পদার্থ?—তাহারা এক একটী কত বড় পদার্থ তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। তাহাদের বৃহত্ত্ব মানুষের জ্ঞানশক্তির অতীত। ক্ষুদ্রতম পিপীলিকা দিগন্তব্যাপী হিমগিরি বা মহাসমুদ্রের আয়তনের কল্পনা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু এক একটী নক্ষত্রের প্রকাণ্ডত্ব অনুভব করিতে আমরা কিছুতেই সক্ষম নহি। সূর্য্য কি প্রকাণ্ড পদার্থ তাহা আমরা এই পত্রিকায় অনেকবার বলিয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে আমাদের পৃথিবী এত বড় হইলেও সূর্য্যের সহিত তুলনায় ইহা একটি বালুকাকণা মাত্র। সুতরাং সূর্য্য কত বড়ই হইবে! কিন্তু এই অসীম অচিন্তনীয় সূর্য্যকে যদি এক একটি নক্ষত্রের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে সে সূর্য্যও অতি ক্ষুদ্র* বলিয়া বোধ হয়। এক একটি নক্ষত্র তবে না জানি কত বড়ই হইবে! পৃথিবী

* নক্ষত্রদিগের মধ্যে গুটিকত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুতঃ ইহারা গ্রহ। ইহারা অবশ্য সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অনেকগুলি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়।

হইতে ইহারা কত দূরে আছে, তাহা গণনা করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। এত দূরে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া ইহারা এত ছোট দেখায়। নহিলে এত বড় হইয়া এত ছোট দেখাইবেই বা কেন?

এক একটি নক্ষত্র কি প্রকাণ্ড তাহা বলা হইল। এখন একটু বিবেচনা করিয়া দেখ এরূপ একটি প্রকাণ্ড পদার্থ যদি হঠাৎ স্খলিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাহইলে তন্মুহূর্ত্তেই কি ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নহে? যাহার সহিত তুলনায় পৃথিবী একটী পরমাণুরও অধম, তাহা যদি স্থানভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইলে আর কাহারও না হউক অন্ততঃ পৃথিবীর বিনাশ কি অনিবার্য্য হইয়া উঠে না? ইহা ছাড়া আর এক কথা এই যে সময়ে সময়ে যে এক একটি জ্যোতি-র্ম্ময় পদার্থকে স্খলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে দেখা যায়, তাহারা আকারে অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং চলিত কথায় আমরা যাহাকে নক্ষত্রপাত বলিয়া থাকি, তাহা নক্ষত্র বিবেচনা করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। বস্তুতঃ সেই সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে নক্ষত্র বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু ইহারা যদি নক্ষত্র না হইল, তবে ইহারা কি?—ইহাদের নাম উল্কা, এবং আমরা যাহাকে নক্ষত্রপাত বা তারাখসিয়া পড়া বলি, তাহা উল্কাপাত ব্যতীত আর কিছু নহে। পৃথিবীর সহিত তুলনায় ইহারা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ—এত ক্ষুদ্র যে শত শত উল্কা পতিত হইলেও একটী পুষ্করিণী পরিপূর্ণ হইয়া যায় না। ইহারা পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া শূন্যমার্গে ঘুরিতেছে, এবং ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত। প্রতি রাত্রিতেই ত উল্কাপাত হইতেছে; বিশেষতঃ সে দিন রাত্রিতে যে কত উল্কা পতিত হইল তাহা কে বলিতে পারে? কথিত আছে কোন সময়ে আমেরিকার বোষ্টন নগরে এক রাত্রিতে নয় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ উল্কা পাত হইয়াছিল। ইহা ত সামান্য কথা। যদি হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কোটি কোটি উল্কাপাত হয়, তথাপি উল্কার সংখ্যা পূর্ব্ববৎই অগণ্য থাকিবে। সুতরাং শূন্যমার্গে কত উল্কা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষ কি তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে?

উল্কাগণ প্রস্তরে গঠিত এবং তাহাদের মধ্যে লৌহ ও গন্ধক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উল্কাপাতকালে এক একটী প্রস্তর স্তূপ স্থানচ্যুত হইয়া অতিবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবমান হয়। এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এত যে অগণ্য উল্কাপাত হইতেছে ইহার ফল ত এই হওয়া উচিত যে শিলাবৃষ্টির ন্যায় অসংখ্য প্রস্তর স্তূপ পৃথিবীর উপরে পতিত হইয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিবে। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা

তাহাত দেখি না। আকাশ হইতে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পৃথিবীর উপরে তাহার ত কোন নিদর্শনই পাই না। তবে এ সকল উল্কা কোথায় যায়? বাস্তবিক কথাটা বড় বিস্ময়কর বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে ততটা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইবে না। নিম্নে যাহা লিখিত হইতেছে, পাঠিকাবর্গ তাহা যদি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখেন তাহাহইলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে সহস্র সহস্র উল্কা স্খলিত হইয়া পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইলে তন্মধ্যে একটিও পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িবে কি না সন্দেহের কথা।

পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া শূন্য মার্গে ঘুরিতেছে, উল্কাগণও তাহাই করিতেছে। দুয়েরই কারণ সূর্য্যের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ বশতঃ উল্কাগণ অন্য দিকে যাইতে না পারিয়া কেবল সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। যদি তাহারা সূর্য্যের অনতিদূরে থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অত আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সূর্য্যের উপরে গিয়া পড়িত। কিন্তু উল্কাগণ বস্তুতঃ সূর্য্য হইতে বহুদূরে;—এত দূরে যে মানুষ তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। এই দূরতা বশতঃ সূর্য্যাকর্ষণের বেগের অনেকটা হ্রাস হওয়ায় উল্কাগণ একেবারে সূর্য্যের উপরে গিয়া না পড়িয়া সূর্য্যকে কেবল প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সূর্য্য যেমন তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবীও তদ্রূপ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তবে সূর্য্যের সহিত তুলনায় পৃথিবী অতি সামান্য পদার্থ বলিয়া পৃথিবীর আকর্ষণে সাধারণতঃ কোন ফল হয় না। মনে কর সূর্য্য যেন একটা প্রকাণ্ড হস্তী আর পৃথিবী যেন একটি ক্ষুদ্র মেষশিশু। যদি কোন পদার্থকে এই হস্তী এক দিকে টানিতে থাকে আর এই ক্ষুদ্র মেষশিশু অপর দিকে টানিতে থাকে, তাহা হইলে সেই পদার্থটি কাজে কাজেই হস্তীর আকর্ষণের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবে। এই জন্যই উল্কাগণের উপরে সাধারণতঃ পৃথিবীর আকর্ষণ কোন ফল উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। সূর্য্যের আকর্ষণের সহিত তুলনায় পৃথিবীর আকর্ষণ খুব সামান্য বটে; কিন্তু উল্কাগণ যদি পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর আকর্ষণের বেগ এত বৃদ্ধি হয় যে তাহারা সূর্য্যকে আর প্রদক্ষিণ না করিয়া পৃথিবীর দিকে ধাবমান হয়। ইহাই উল্কাপাতের একমাত্র কারণ। পৃথিবীর আকর্ষণ অতি সামান্য বলিয়া পৃথিবী সাধারণতঃ উল্কাগণের কিছুই করিতে পারে না। কিন্তু উল্কাগণ পৃথিবীর

নিকটবর্ত্তী হইলে এই সামান্য আকর্ষণ হইতে এত বেগ উৎপন্ন হয় যে তাহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিতে থাকে। সূর্য্য যেখানকার সেইখানেই থাকে; কিন্তু পৃথিবী ও উল্কাগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া প্রায়ই তাহারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে; এবং যে উল্কাটী পৃথিবীর খুব নিকটে আসিতেছে সে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মহাবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইতেছে। চলিত কথায় ইহাকেই আমরা নক্ষত্রপাত বলিয়া থাকি।

আমরা দেখিতে পাই যে হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়; কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে কাষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। আমরা ইহাও জানি যে দুইটি সামগ্রী পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হইতে পারে যে তাহাহইতে অগ্নি উৎপন্ন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ইহাও আমাদের জানা আছে যে যত বেগে ঘর্ষণ হয়, উত্তাপও তত অধিক হয়। শীতকালে হাত শীতল হইলে যদি খুব জোরের সহিত হাত ঘর্ষণ করা যায়, তবেই হাত উত্তপ্ত হয়, নচেৎ বিশেষ উত্তাপ অনুভব করিতে পারা যায় না। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া একবার উল্কাপাতের বিষয় ভাবিয়া দেখ। উল্কাগণ পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইবার সময় কি ভয়ানক বেগে ছুটিতে থাকে! এ অবস্থায় কোন বস্তুর সহিত তাহাদের ঘর্ষণ হইলে তাহারা কি উত্তপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে না? যে বেগে তাহারা ছুটিতে থাকে, তাহাতে কোন বস্তুর সহিত ঘর্ষণ হইলে তাহারা অবশ্যই প্রজ্বলিত হইবে। কিন্তু যাহার সহিত ঘর্ষণ হইতে পারে এমন কোন পদার্থ কি তাহাদের পথে পড়িয়া আছে?—আছে বৈ কি। বায়ু ভেদ না করিয়া কিছু উল্কাগণ পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না; সুতরাং বায়ুর সহিত তাহাদের কাজে কাজেই ঘর্ষণ হয়, এবং সেই ঘর্ষণ বশতঃ এত উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে তাহাতে তাহারা একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কিন্তু বায়ুর সহিত ঘর্ষণের কথা পড়িয়া অনেকে হয় ত হাসিবেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে আমাদের শরীরেরও ত বায়ুর সহিত ঘর্ষণ হইতেছে, তবে আমরা কেন জ্বলিতে থাকি না? কিন্তু আমরা কি উল্কার ন্যায় বেগে বায়ুর মধ্যে গমনাগমন করিতেছি? তাহা যদি করিতাম, তাহা হইলে আমরা অবশ্য উল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতাম।

এখন পাঠিকাগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে এত যে উল্কাপাত হয়, তাহারা কোথায় যায়? পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যেই একটি উল্কা বায়ুসাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ ইহা বায়ুর সহিত ঘর্ষণে এত উত্তপ্ত হয় যে প্রজ্বলিত হইতে থাকে। এই

উত্তাপে দগ্ধ হইয়া ইহার প্রস্তর লৌহ গন্ধকাদি সমুদয় বাষ্পাকারে পরিণত হয়, এবং সুতরাং সে প্রস্তরস্তূপ আর পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িতে পারে না। উলকাগণ এইরূপে বাষ্পে পরিণত হইয়া যায় বলিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, নহিলে তাহাদের আঘাতে পৃথিবীতে কি কেহ বাস করিতে পারিত? সময়ে সময়ে দুই একটি উল্‌কা পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে, এবং লোকালয়ের মধ্যে পড়িলে তাহাতে ক্ষতিও হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত যে উল্‌কাগণ প্রায়ই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায়, এবং এইরূপে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যায় বলিয়াই আমাদের রক্ষা।

কোল জাতি।

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

কোল জাতির মধ্যে জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু ইহারা অন্য কোন জাতির অন্নও খায় না।

কোল জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহের রীতি নাই। স্ত্রী অথবা পুরুষের বিশ বৎসরের অনধিক বয়সে প্রায় বিবাহ হয় না। ইহাদিগের বিবাহের নিয়ম কৌতুকাবহ। ইহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত নাই। কেবল কন্যার পিতা মাতাই পণ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মহিষ ২০টা, গরু ২০টা, ভেড়া ২০টা ও নগদ ২০, টাকা পণের নিয়ম ছিল। অপর সাধারণ লোকেরা এরূপ কঠিন পণের নিয়ম প্রতিপালনে সক্ষম হইত না। এজন্য দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে প্রায় বিবাহ হইত না। সুতরাং লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি হইত না। অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকিত এবং অনেক স্ত্রীলোকও আজীবন কুমারী অবস্থায় পিত্রালয়ে বাস করিত। এরূপ কুমারী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এখনও দেখা যায়। সিংহভূম জেলার ভূত-পূর্ব্ব ডেপুটী কমিসানর ডাক্তর হেজ বহুল পরিশ্রম ও কৌশল দ্বারা দরিদ্রদিগের জন্য পণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পণের দশমাংশ দিতে সক্ষম হইলেই নির্ধনী লোকেরা বিবাহ করিতে পারে।

অবিবাহিত অবস্থায় কোল জাতীয় যুবক যুবতীগণ একত্রে নৃত্য গীত, আমোদ প্রমোদ, ও যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা বা নিন্দা হয় না, কিন্তু বিবাহের পর আর ঐরূপ ব্যবহারের রীতি নাই। ঐরূপ নৃত্য গীত ও আমোদ প্রমোদের সময়, কোন

যুবক যুবতীর পরস্পর মনের মিলন হইলে, তাহারা স্বয়ংই বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পুত্র বা কন্যার বিবাহের জন্য পিতা মাতার কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কোলদিগের মধ্যে, বিবাহের সময়, পিত্রালয় হইতে কন্যাকে লইয়া যাইবার রীতি নাই। কোন যুবক যুবতী বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উভয়ের পিতা মাতা বিবাহের কথাবার্ত্তা ও পণ স্থির করে। পরে, কন্যার পিতা কিম্বা আত্মীয়বর্গ বরপক্ষকে বলিয়া দেয় যে অবধারিত দিনে কন্যাকে কোন নির্দ্ধারিত গাছের তলায়, কোন নদী-তীরে, কিম্বা কোন হাটে দেখিতে পাইবে। বরের আত্মীয় ব্যক্তিরা তদনুসারে অবধারিত দিনে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কন্যার অনুসন্ধান করিতে থাকে, ও তাহাকে দেখিতে পাইলেই ধরিতে যায়। কিন্তু কন্যা ইতস্ততঃ দৌড়িতে থাকে, সহজে ধৃত হয় না। ধৃত হইলেও সে বরপক্ষীয় লোকদিগকে লাথি মারে, চপেটাঘাত করে ও কামড়াইতে যায়। সহজে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে যাইতে চাহে না। পিতা মাতার প্রতি স্নেহ, মমতা দর্শাইবার জন্য কন্যাদিগের ঐরূপ ব্যবহারের রীতি আছে। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কন্যা ধৃত হয় ও বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের সহিত চলিয়া যায়। বরের আত্মীয় ব্যক্তিরা বাটীতে পৌঁছিয়া বর কন্যাকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি ও হাড়িয়া মদ্য সহিত একটী ঘরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার বদ্ধ করে ও ঘরের চারিদিক কাঁটা দ্বারা এরূপ বেষ্টন করে যাহাতে কন্যা কোন মতে পলাইতে না পারে। দুই তিন দিন পরে, বর কন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাহিরে আসিতে চাহিলে, বরপক্ষীয় লোকেরা দ্বার খুলিয়া দেয় ও বাদ্য বাজনা করিয়া বিবাহ সম্পাদন করে। বিবাহের কিছু দিন পরে, বর সস্ত্রীক শ্বশুরালয়ে গমন করে। তথায় নৃত্য গীত ও নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হয়, কিন্তু বর রাত্রে স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়ন করিতে পায় না। কোল জাতি, হিন্দুস্থানী ও উড়িয়াদিগের মধ্যে এই রীতি আছে যে জামাতা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রী-সহবাস করিলে শ্বশুরের অপমান ও লজ্জা বোধ হয়, এজন্য জামাতাকে বাটীর বাহিরে শয়ন করিতে হয়।

কোল জাতির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ গ্রামস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা মৃত ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া ক্রন্দন করিয়া যায়। পরে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ জঙ্গল হইতে একটী বড় গাছ কাটিয়া একটী ডোঙ্গা প্রস্তুত করে। ঐ ডোঙ্গার ভিতর মৃত দেহ ভরিয়া গৃহদ্বারে দাহ করে। সংস্কার শেষ হইলে ২।৩ খানি অস্থি একটী মাটীর ভাণ্ডে ভরিয়া ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখে। কিছুদিন পরে, শ্মশানবন্ধুদিগের ভোজনোপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজন হইলে, গ্রামস্থ লোক পুনরায় একত্রিত

হইয়া ঐ অস্থিপূর্ণ মাটীর ভাণ্ডটী এক খানি দীর্ঘ বাঁশের অগ্রভাগে বান্ধিয়া বাদ্যবাজনা করিয়া গ্রামের চারিদিকে ভ্রমণ করে। ঐ ভাণ্ডটী বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত স্থানে মাটীর নীচে পুতিয়া তাহার উপর এক খানি দীর্ঘ পাথর সংস্থাপন করে। পরে, আহারাদি করিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়।

কোলদিগের মধ্যে বালক বালিকার নামকরণের বিশেষ কোন নিয়ম নাই। ইহাদিগের পুরুষের নামের শেষে একটী "হো" শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং ইহাতে কোল জাতীয় লোক বুঝায়। যথা, অমুক হো।

এক্ষণে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হওয়াতে, কোল জাতি ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে। অনেকে হিন্দী ভাষায় লিখিতে পড়িতে ও বলিতে শিক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। স্কুলের কোল ছাত্রেরা ধুতি চাদর, পীরাণ ও জুতা পর্য্যন্ত ব্যবহার করে। খ্রীষ্টীয় মিসনরীদিগের অনুগ্রহে, অনেকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মও অবলম্বন করিয়াছে। সিংহভূম জেলার প্রধান নগর চাইবাসার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে একজন কোল অনরেরী (অবৈতনিক) মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছে। চাইবাসার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে একজন কোল বহু দিন পর্য্যন্ত শিক্ষক নিযুক্ত ছিল, ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিত। এখনও আর এক জন মডেল স্কুলের শিক্ষকের কার্য্য করিতেছে। নরমাল স্কুলের অনেক কোল ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু নিযুক্ত হইয়াছে।

সিংহভূম জেলায় কোলেরা গবর্ণমেণ্টের খাস্ তালুকে বাস করে। গ্রামের প্রধানকে "মান্‌কী" ও মোড়লকে "মুণ্ডা" বলে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহ জন্য তথায় ভিন্ন জাতীয় কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয় না। কোলেরা নিজে নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করে। এজন্য মান্‌কী শতকরা ৭৲ টাকা ও মুণ্ডা ১০৲ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্ট হইতে কমিসন পায়। মান্‌কীর অধীনে পাঁচ সাত খানি গ্রাম থাকে, কিন্তু প্রতি গ্রামেই একটী মুণ্ডা আছে।

কোল জাতির ভাষা মৌখিক মাত্র. কিন্তু অতিশয় দুরূহ। ইহার বর্ণ-মালা নাই। স্কুলের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, এক্ষণে হিন্দীভাষায় ও দেব-নাগরী অক্ষরে কোল্ ভাষা লিখিত ও পঠিত হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (ভাগবত) কাল।

(গত প্রকাশিতের পর।)

মহর্ষি কপিল স্বীয় মাতাকে যে বিষয় অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন, তাহা সাংখ্য দর্শনের অন্তর্গত অতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। পাঠক পাঠিকারা ধীরভাবে এ বিষয় আলোচনা করিলে, ইহার গুরুত্ব কত, অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

৯।—দেবহূতি।

কপিল পুনরায় কহিতে লাগিলেন, দেবি! যাহা দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি শিথিল ও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,—পরমাত্মার সন্দর্শন সম্পাদিত হয়,—মোক্ষলাভার্থ সুধীগণ যে বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,—সেই জ্ঞান-সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি আত্মস্বরূপ, আদি-রহিত, স্বয়ং-প্রকাশিত এবং গুণ ও প্রকৃতি-সঙ্গ-বিহীন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার প্রভাব-বলে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই পরম পুরুষ। প্রকৃতি, বিষ্ণু-শক্তি-প্রতি-রূপা ও অব্যক্তগুণশালিনী। তিনি লীলাক্রমে বিষ্ণুর নিকটবর্ত্তিনী হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সমুদয় ক্রিয়া প্রকৃতির গুণ প্রযুক্ত নিষ্পাদিত হয়, প্রকৃতির সঙ্গে উৎকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া, তৎসমস্ত তাঁহার কর্ত্তৃত্বসাধ্য, এইরূপ মনে করেন। জননি! পুরুষ স্বয়ং সাক্ষীমাত্র—সুখ-স্বরূপ। কোন কর্ম্মেই তাঁহার প্রভুত্ব নাই। প্রকৃতিই—কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্বের মূলীভূত হেতু। আর, পুরুষ কেবল সুখ-দুঃখের উপভোক্তা।

দেবহূতি।—এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্য-মান বিশ্বের সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্য, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে বুঝিলাম বটে,—কিন্তু, হে প্রিয়দর্শন! সম্প্রতি তুমি উহাদের লক্ষণ বর্ণন পূর্ব্বক আমার গোচর কর।

কপিল।—জননি! সনাতন, সত্ত্ব-রজস্তম-গুণোপেত, অব্যক্ত-কার্য্য-কারণ স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ ও সকলের আশ্রয়ভূত যে বস্তু,—তাহাই প্রকৃতি। সলিল, ভূমি, আকাশ, বহ্নি, বায়ু—এই পঞ্চ ভূত; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই পঞ্চ তন্মাত্র; শ্রুতি, রসনা, ত্বক্‌, নাসা, নয়ন, বাক্য, পাদ, পায়ু, পাণি, উপস্থ—এই ১০ দশ বহিরিন্দ্রিয়; অহঙ্কার, চিত্ত, মন, বুদ্ধি—এই ৪ চারি অন্তরিন্দ্রিয়;—মোটে এই ২৪ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ইহা সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশস্থল। 'কাল' লইয়া, ২৫ পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব পরিগণিত হয়। কাহারও কাহারও মতে 'কাল' এক স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তাঁহারা বলেন,—উহা বিশ্বপতির

প্রভাব বৈ আর কিছুই নয়। আর, পুরুষ—সূর্য্যের সদৃশ নির্গুণ নির্ব্বিকার, ও কর্ত্তৃত্ববিবর্জ্জিত। 'আমি কর্ত্তা'—যে মুহূর্ত্তেই পুরুষ অভিমান করেন, তদণ্ডেই তিনি প্রকৃতিতে সমাসক্ত হইয়া পড়েন; সুতরাং নিরানন্দ ও অনয়াত্ত হন। অর্থ-ব্যতিরেকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট। এদিকে আবার,বিষয় ব্যাপারাদি-চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিলে, পুরুষের রাশি রাশি অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে। এই নিমিত্তই বলি,—চিত্তবৃত্তি অসাধু মার্গে প্রধাবিত হইলে পর, প্রগাঢ় ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশতাপন্ন করা কর্ত্তব্য।

অপর, যম নিয়মাদি যোগ দ্বারা চিত্ত আয়ত্ত করিয়া শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, সমগ্র ভূতে সমদৃষ্টি, ও মৌন অবলম্বন, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান, বিষয়-নিস্পৃহতা, বিজন-স্থানে অবস্থিতি, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিলেই, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। ভগবতি! জলস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, ভূভাগস্থ ভাস্কর-বিম্ব দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, এবং সলিলস্থ ভানু-প্রতিবিম্ব-সহযোগে যেরূপ গগনতল-স্থিত রবি দৃষ্ট হন,—ইন্দ্রিয়, ভূত ও মনোময় আত্মার প্রতি-বিম্ব দ্বারা সেইরূপ ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব রূপে অবলোকিত হইলে, সেই অহঙ্কার দ্বারা পরমার্থ-পরিজ্ঞান-রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার ঘটে।

দেবহূতি।—বৎস! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই যে নিত্য এবং উভয়েই উভয়ের যে আশ্রয়স্বরূপ, তাহা আমার হৃৎপ্রত্যয় হইল। ক্ষিতি ও গন্ধ যেমন পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না,—রস ও নীরের যাদৃশ অভেদ্য সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া, যেমন উহারা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে না,—তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষ সংপৃক্ত, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সংবদ্ধ।

কপিল।—এক্ষণে সাবলম্বন যোগ বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উহা দ্বারা মন মলারঞ্জিত ও সন্মার্গে ধাবমান হইতে থাকে। যথাশক্তি নিত্যাশ্রিত ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধার্ম্মিকগণের বন্দন, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কারণ অনুরাগ প্রকাশ, অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ না করা, পরিমিতাহার, জনশূন্য স্থানে অবস্থান, অহিংসাদি উৎকৃষ্ট ব্রত গ্রহণ, সত্য কথন, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শুদ্ধ চার, ঈশ্বরের আরাধনা এবং প্রাণায়ামাদির সহায়তাবলে অন্তঃ-করণকে যোগ পথের দিকে ধাবিত করিতে হয়। বহ্নি ও বাত দ্বারা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা লাভের ন্যায়, যোগী শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধ করিতে পারিলেই,শুদ্ধান্তর হন। প্রাণায়াম দ্বারা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা দোষ,—ধারণা দ্বারা মনোমালিন্য,—ও ধ্যান দ্বারা নাস্তিকতা বিদূরিত করিতে হয়। অতঃপর যোগমাহাত্ম্যে চিত্ত-প্রবৃত্তি অমল ও সুসমাহিত হইলে পর, নাসিকাগ্র ভাগে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডপতির চিন্তায় মনঃসংযম করা

কর্ত্তব্য। ভক্তগণের হৃদয় মনই তাঁহার উপবেশনোপযুক্ত একমাত্র আসন।

দেবহূতি।—সাংখ্য দর্শন গ্রন্থে প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতির বৃত্তান্ত যেরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তুমি তাহার উল্লেখ করিয়াছ। অধুনা তাহার মূল-স্বরূপ ভক্তি-যোগের বিষয় বর্ণন কর। উহা শ্রবণ করিলে, জীব সাংসারিক ব্যাপারে নিস্পৃহ হইয়া পড়ে। তুমি যেরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছ ও করিতেছ, তাহাতে আমার মনে হয়, তুমিই যেন যোগ-প্রকাশক দিনমণি।

কপিল।—দেবী! ভক্তিযোগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ভেদদর্শীর যোগ—তামস, অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোগ; ধন-মান বা খ্যাতি-প্রতিপত্তির আশায় যে যোগ সমাহিত হয়, তাহা রাজস যোগ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ তাহাও উত্তম যোগ নহে—মধ্যমবিধ যোগ। কিন্তু পাপ ধ্বংস করা উচিত, জগদীশের প্রতি প্রীতি প্রকাশ না হইলে জীবের গত্যন্তর নাই, এবম্ভূত বোধ হওয়াই, সাত্ত্বিক যোগ এবং ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার অন্য নাম নির্গুণ ভক্তি-যোগ। যেমন—সুরধুনী-বারি, সমুদ্র-নীরে নিপতিত হইলেই, সাগর-সলিলের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নিষ্কাম মনোগতি (অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে পার্থিব কামনা-হীন প্রার্থনা) সেই ভাব লাভ করে, সুতরাং তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয় পদার্থ।

কপিলদেবের মহার্হ শিক্ষা লাভ করিয়া, কর্দ্দম-দয়িতা দেবহূতির প্রকৃত তত্ত্ব-দৃষ্টি জন্মিল। জননী ও সন্তানে পরস্পরে কি উচ্চ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, পাঠিকাগণ আবিষ্টমনে অনুধাবন না করিলে, অদ্যকার বর্ণিত ললনা-রত্নের গুণাবলীর প্রাধান্য অবধারণে সক্ষম হইবেন না। কপিলের যশে তাঁহার গর্ভধারিণী যশস্বিনী, আপাততঃ এই প্রকার বোধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ প্রসূতির গুণেই সন্ততি গুণান্বিত হয়। দেবহূতির প্রথমাবস্থার চরিত বিবরণে তাহাই সুব্যক্তরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। বীর নেপোলিয়ন্ এক সময়ে বর্ষীয়সী কোন ফরাসী কামিনীকে 'ফ্রান্সের অভ্যুদয়ের কারণ কি?' জিজ্ঞাসা করিয়া "ফ্রান্সদেশের বীর-প্রসূ বরারোহাগণের লোকোত্তর ক্ষমতাই তাহার হেতু"—যেমন এই সদুত্তর পাইয়াছিলেন,—আমাদিগকে সেইরূপ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—কপিল যে "আদি বিদ্বান" নামে পরিচিত, 'সাংখ্য শাস্ত্রের তুল্য আর শাস্ত্র নাই'—* তাঁহার শাস্ত্রের যে এরূপ অসাধারণ আদর,—তাহার কারণ কি? তদুত্তরে আমরা বলিব, কপিল-মাতা দেবহূতিই তাহার অদ্বিতীয় হেতু। এতদ্ভিন্ন অন্য পরিচয়ও উল্লিখিত রূপ গৌরবজনক। এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব ভাগে (গত মাস) উক্ত হইয়াছে, তিনিই ভক্ত প্রবর

* "নাস্তি সাংখ্য-সমং জ্ঞানং।"

ধ্রুবের পিতৃস্বসা (পিসী)। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরা 'আকূতি' ও কনিষ্ঠা ভগিনী 'প্রসূতি'র সম্বন্ধেও তিনি অল্প শ্লাঘ্য নহেন। কন্যা-বর্গের ভর্তৃ-কুলের সংস্রবও বিলক্ষণরূপ শ্লাঘ্য-স্থল। আর, তাঁহার স্বীয় পতির সদ্গুণ উপমাহীন বলিলেও চলে। পুত্রের গরিমার তো পরিসীমাই হয় না।

দেবহূতির চরিত্র আলোচনা দ্বারা দুটী বিষয় প্রতীতি হইতে থাকে। প্রথমতঃ তাঁহার পরিণয় ব্যাপার, অসবর্ণ বিবাহের এক প্রধান উদাহরণ। দ্বিতীয়তঃ,এই উদ্বাহটী বাল্যবিবাহ পরিচায়ক কার্য্য নহে,—প্রত্যুত, বয়ঃস্থ অবস্থায় সমাহিত হয়।

এস্থলে, কপিল-বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে। গত মাসে দেবহূতি-নন্দন কপিলকে আমরা অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, অর্থাৎ দ্বিতীয় কপিল বলিয়াছি, বেদান্ত-দর্শনের শারীরিক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য তাহার আভাস দিয়াছেন। শঙ্করদেবের উক্তিতে দ্বিতীয় কপিলের নামান্তর "বাসুদেব" প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু দেবহূতি-কুমারের যে অপর নাম 'বাসুদেব,—তাহার প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে এই কপিল সাংখ্যদর্শনের মতই শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি সাংখ্যসূত্রকার প্রাচীন কপিল ও তাঁহার অন্য আখ্যা—"আদি বিদ্বান্"। নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা [প্রথম] কপিলকেই পুরাণকারেরা সেশ্বর সাংখ্যকার-ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পুরাণকর্ত্তারা মূল বেদ, উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি হইতে মূল আদিম বিষয় সংগ্রহ পুরঃসর যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহা সময়ান্তরে বিলক্ষণ প্রমাণ করিয়া দিব।

রমণীগণের মানসিক শিক্ষা।

মন ও শরীরের মধ্যে বেশ একটু সম্বন্ধ আছে। শরীরের মধ্যে আবার মস্তিষ্ক (Brain), মেরুদণ্ডের মজ্জা (Spinal chord) এবং স্নায়ু শাখা প্রশাখার (Nerves) সহিত মনের সম্বন্ধটা অপেক্ষাকৃত গুরুতর। ইহা দেখিয়া জড়বাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে "শরীরের কতকগুলি কার্য্য মষ্টিকে মন বলা যায়, শরীর ভিন্ন মনের অস্তিত্ব নাই।" পক্ষান্তরে অধ্যাত্মবাদী (Spiritualist) পণ্ডিতগণ বলেন "শরীর মনের যন্ত্রমাত্র। সূত্রধর যেরূপ যন্ত্র-ভিন্ন কার্য্য করিতে পারে না, অথচ সূত্রধর ও যন্ত্রের দুইটী বিভিন্ন সত্তা, মনও সেইরূপ শরীর ভিন্ন কার্য্য করিতে পারেনা, কিন্তু উভয়ের সত্তা ভিন্ন ভিন্ন।"

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু জড়বাদীদিগের একটী যুক্তি লইয়া যাঁহারা রমণীগণের মানসিক শিক্ষার উপর একটু কটাক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মত সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিখ্যাত চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণ লোকদিগের হইতে বেশী। পক্ষান্তরে নির্ব্বোধদিগের মস্তিষ্কের ওজন সাধারণ লোকের অপেক্ষা কম। বিখ্যাত ইউরোপীয় পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কুবিয়ারের মস্তিষ্ক ওজন করিয়া ৬৪॥ আউন্স, এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার এবারক্রম্বির মস্তিষ্ক ৬৩ আউন্স হইয়াছিল। এদিকে নির্ব্বোধ লোকদিগের মস্তিষ্ক উর্দ্ধতন ২৭ আউন্স হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পুরুষদিগের মস্তিষ্ক সাধারণতঃ ৪৬ আউন্স হইতে ৫৩ আউন্স এবং স্ত্রীলোকদিগের মস্তিষ্ক ৪১ হইতে ৪৭ আউন্স হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন গড় ৪৯॥ আউন্স, স্ত্রীদিগের গড় ৪৪ আউন্স হয়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যাঁহার মস্তিষ্ক ওজনে যত ভারী, তাঁহার মানসিক ক্ষমতা তত অধিক। আবার হাতী ও তিমি মাছের মস্তিষ্কের গুরুত্ব দেখিয়া তাঁহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে হাতী ও তিমি মাছের শরীর নাড়িবার জন্য অনেক স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের স্নায়ুকেন্দ্র মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত ভারী না হইলে চলিবে কেন? যদি হাতী ও তিমি মাছের মস্তিষ্কের অসাধারণ গুরুত্বের অন্য উদ্দেশ্য থাকে, তবে মানুষের বেলা সেইরূপ হইবে না কেন? শরীর স্পন্দন, রক্ত সঞ্চালন এবং আহারীয় বস্তু জীর্ণ করিবার জন্য কুবিয়ারের অপেক্ষাকৃত অধিক স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহা বলি না কেন? ইউরোপীয় পুরুষদিগকে অধিকতর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, সুতরাং রমণীদিগের হইতে তাহাদিগের অধিকতর স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন। গুরুতর মস্তিষ্ক না হইলে ঐরূপ স্নায়বীয় শক্তি উৎপন্ন হয় না, এইরূপ মীমাংসা না করিয়া কেন বলা হয় যে কুবিয়ারের অসাধারণ মস্তিষ্ক এবং ইউরোপীয় সাধারণ পুরুষদিগের অপেক্ষাকৃত ভারী মস্তিষ্ক কেবল মানসিক শক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনেরই জন্য। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কুবিয়ার অন্য বিষয়ে অসাধারণ লোক ছিলেন না। কেবল মানসিক শক্তিতেই তিনি মানব জাতির মধ্যে অসামান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব কেবল মানসিক শক্তিরই পরিচায়ক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে অপরিমিত মস্তিষ্ক-গুরুত্বই অসাধারণ মানসিক শক্তির কারণ? কি মনোবৃত্তির অসাধারণ সঞ্চালনই মস্তিষ্ক-

গুরুত্বের কারণ? শরীরের যে কোন ভাগই হউক, নিয়মিত সঞ্চালন করিলেই তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয়। যাহারা ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহাদের হস্ত পদ ও বক্ষঃস্থলের মাংসপেশী আয়তনে ও ওজনে বাড়িয়া থাকে। মনোবৃত্তি সঞ্চালনেও সেইরূপ মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চিন্তা করিবার সময় রক্তের গতি অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের দিকে হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে রক্ত পাইয়া মস্তিষ্ক তাহা হইতে অধিক পরিমাণে উপযোগী পদার্থ টানিয়া লইয়া নিজ অঙ্গের পোষণ করে। অধিকতর পুষ্টিকর জিনিস পাইয়া তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মানসিক শিক্ষাই মস্তিষ্কের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ। যাহারা মানসিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিনে, তাহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারেনা। এই জন্যই ইউরোপীয় রমণীগণের মস্তিষ্ক পুরুষদিগের মস্তিষ্ক অপেক্ষা লঘুতর। যদি তাঁহারা পুরুষদিগের মত শিক্ষা পান, তাহাহইলে তাঁহাদের মস্তিষ্কের গুরুত্ব পুরুষদিগের মস্তিষ্কের গুরুত্ব অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। এজন্যই আমরা বলি যে কেবল মস্তিষ্কের ওজনের বৈষম্য দেখিয়া স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে মীমাংসা করা যাইতে পারে না। এক জন লোককে চিরকাল অন্ধকারে রাখিয়া আলোতে একবার ছাড়িয়া দেও, সে আলো সহ্য করিতে পারিবেনা; তাই বলিয়া কি তুমি বলিবে ঈশ্বরই তাহাকে এরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহার আর আলোতে যাইবার প্রয়োজন নাই? রমণীগণের অবস্থা কি ঠিক এইরূপ নয়? বহুদিন হইতে তাহাদিগকে তোমরা মূর্খতার অন্ধকারে রাখিয়াছ, এজন্য তাহাদের মস্তিষ্ক রীতিমত প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। এখন কি তোমরা বলিবে যে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পুরুষদিগের অপেক্ষা স্বল্পমস্তিষ্কবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা কদাচ পুরুষের মত মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে পারে না? স্বার্থপর পুরুষ! তোমরা দোষ করিয়া ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিতে কুণ্ঠিত হইওনা। যদি তোমরা দেখাইতে পার যে অসভ্য মানুষ ও পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও এই নিয়ম, তবে আমাদিগকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পার। তথাপিও আমরা বলিতে পারি যে পুরুষদিগের হয়ত এমন কোন কাজ করিতে হয়, যাহা স্ত্রীগণ করিতে পারে না। তোমরা বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই অহঙ্কারে মত্ত হইতেছ। আমরা জানি উন্নতিই মানবজীবনের লক্ষ্য। কিন্তু যে উপায়ে রমণীগণ জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতিসাধন করিয়া বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইত, তোমরা সেই উপায় বিনষ্ট করিয়াছ। তোমরা কি এজন্য দায়ী নও? স্বার্থপর পুরুষ! তোমাদিগকে সম্বোধন করি কেন, তোমাদিগকে দোষী করি কেন? তোমরা সবল? তাই তোমরা সমাজের

নেতা। তোমরা সমাজকে যে নিয়মে চালাইবে, তাহা সেই নিয়মেই চলিবে, সুতরাং তোমাদের কার্য্যের জন্যই কি তোমরা দায়ী নও? যদি তোমরা নিষ্কলঙ্ক থাকিতে চাও, তবে অসার যুক্তি দ্বারা আর অন্যায়ের প্রশ্রয় দিওনা, রমণীদিগের মানসিক শিক্ষার প্রতিবন্ধক হইওনা।

নারীজাতি সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা।

(২৫২ স, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টম অধ্যায়ে দণ্ডবিধি স্থলে সংহিতাকার লিখিয়াছেন—

ন সম্ভাষাং পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধ
সমাচরেৎ।
নিষিদ্ধো ভাষমাণস্তু সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি ॥
৮ ; ৩৬১ ॥

পরস্ত্রীসম্ভাষণ নিষিদ্ধ; করিলে এক সুবর্ণ মুদ্রা দণ্ড হইবেক।

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতি-
গুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে
বহুসংস্থিতে ॥ ৮ ; ৩৭১ ॥

যে স্ত্রীলোক ধনিকন্যাদর্পে এবং স্বকীয় সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া নিজপতিপরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষ ভজনা করে, উহাকে রাজা বহুজন সমক্ষে কুক্কুরদ্বারা ভক্ষিত করাইবেন।

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত-
আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত
পাপকৃৎ ॥ ৮ ; ৩৭২ ॥

এবং উক্ত পাপপ্রলিপ্ত পুরুষকে উত্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ান করাইয়া, তদ্দেহে অনল প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠ ভস্মাবশেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঘাতকেরা তাহার দাহার্থ কাষ্ঠনিক্ষেপে ক্রটি করিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়ে মহাত্মা মনু স্ত্রীধর্ম্ম বিষয়ে লিখিয়াছেন—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া ॥
৫ ; ১৫০ ॥

স্বামী কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই হৃষ্ট থাকিবেক, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিবেক, গৃহ-সামগ্রী সকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছিন্ন রাখিবেক, এবং ব্যয় বিষয়ে মুক্তহস্ত হইবেক না।

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা
বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন
লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫ ; ১৫১ ॥

পিতা যাহাকে কন্যাদান করেন, অথবা পিতার আদেশে ভ্রাতা যাহাকে ভগিনী দান করে, সেই স্বামী যতদিন জীবিত

থাকিবে, তাহার শুশ্রূষা বিষয়ে পত্নীর অনাস্থাপ্রদর্শন বিধেয় নহে; এবং ঐ স্বামী লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার শ্রাদ্ধতর্পণাদি কার্য্যে ঔদাস্য করিবে না।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং
নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে
মহীয়তে॥ ৫; ১৫৫॥

রমণীদিগের পতি ব্যতিরিক্ত যজ্ঞ নাই, পতির অনুমতি ব্যতিরেকে ব্রত বা উপবাস হইতে পারে না। তাহারা কেবল ভর্ত্তৃপরিচর্য্যাদ্বারাই স্বর্গগমনে অধিকারিণী হয়।

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুল-
সন্ততিম্॥ ৫; ১৫৯॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে
ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে
ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫; ১৬০!

বালখিল্যাদি অনেক সহস্র ব্রহ্মচারিগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছেন। অতএব সাধ্বী সন্তানহীনা হইলেই যে স্বর্গলাভে বঞ্চিতা হইবে এ কথা প্রামাণিক নহে। ফলতঃ পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই রমণীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সন্তান না থাকিলেও তাহারা বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই স্বর্গ গমনে অধিকারিণী হইবে।

রমণীর ধনপরিরক্ষণ বিষয়ে ব্যবস্থাপক বলিয়া গিয়াছেন:—

বশাপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং
নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ
॥ ৮; ২৮॥
জীবন্তীনান্তু তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ
স্ববান্ধবাঃ।
তাঞ্ছিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্ম্মিকঃ পৃথিবী-
পতিঃ॥ ৮, ২৯॥

পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকদিগের ধনের ন্যায় বন্ধ্যা বিধবা প্রভৃতি অভিভাবক-শূন্যা রমণীর ধন পরিরক্ষণেও নরপতি অধিকারী। যদি বিধবা প্রভৃতি অসহায়া রমণীর ধন তদীয় বান্ধবগণ ছলপূর্ব্বক হরণ করে, তাহা হইলে ঐ কুটুম্বগণ ধর্ম্মদর্শী নরপতি-কর্ত্তৃক চৌরদণ্ডে দণ্ডিত হইবেক।

পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো
ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ
পতন্তি তে॥ ৯; ২০০॥

ললনাগণ পতির জীবদ্দশায় যে অলঙ্কার ধারণ করিবে, পতির মরণোত্তর দায়াদ-গণ উহা বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে না।

বামাবিষয়ক ব্যবস্থানিচয় সংহিতা মধ্যে একস্থানে ধারাবাহিকরূপে সন্নিবিষ্ট নহে। অবলাকুল সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তত্তাবৎ সংগ্রহ

করিয়া এই প্রবন্ধ মধ্যে নিবদ্ধ করিলাম। নারী সম্বন্ধীয় মনুপ্রোক্ত ব্যবস্থাগুলিকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১ম, শিষ্টাচার পদ্ধতি; ২য়, উদ্বাহ পদ্ধতি; ৩য়, স্ত্রীচরিত্র পরিরক্ষণ; ৪র্থ, মহিলাগণের প্রতি ব্যবহার; ৫ম, দণ্ডবিধি; ৬ষ্ঠ, রমণীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ৭ম, স্ত্রীধন পরিরক্ষণ। ১ম, শিষ্টাচার পদ্ধতি। পরপত্নীদিগকে "ভগিনী!" বলিয়া সম্বোধন করিবে, মাতুলানী প্রভৃতিকে আপন জননীতুল্য দেখিবে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নীর প্রণতভাবে চরণবন্দন করিবেক, প্রভৃতি উপদেশ যে অতীব সমীচীন ইহা আমরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ২য়, উদ্বাহপদ্ধতি। উদ্বাহ পদ্ধতি স্থলে মনু অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অতীব জঘন্য। এরূপ জঘন্য বিবাহের কথা সংহিতামধ্যে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া আমরা ব্যবস্থাপকের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে অধিকারী নহি। তিনি তাঁহার জীবনকালে দেশমধ্যে যে সকল প্রচলিত পরিণয়প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এবং উক্ত পরিণয়বিধি যে অতীব দূষ্য তাহাও তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার সময়ে যে অনেক অসভ্য প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং উক্ত পরিণয়প্রণালী যে তৎপরিচায়ক, তাহা আর যুক্তি-সাপেক্ষ নহে। ৩য়, স্ত্রীচরিত্র পরিরক্ষণ। রমণীগণের প্রতি মহাত্মা মনু আত্যন্তিক অবিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন। স্ত্রীচরিত্র বিষয়ে ব্যবস্থাপকের আশঙ্কা সম্পূর্ণই অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ললনাগণের অনুরাগের দৃঢ়তা এবং চিত্তের যে অস্খলিত বিশুদ্ধি আছে, তাহাতে আমরা অণুমাত্রও সংশয় করি না। যদিই আমাদিগের চিত্ত কখনও সন্দেহতিমিরে সমাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতির সতীত্ব জ্যোতিঃ কি সে তিমির বিদূরিত করিতে পারে না? ৪র্থ, স্ত্রীগণের প্রতি ব্যবহার। স্ত্রীদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে ক্লেশ দেওয়া অতীব অবৈধ; যে সংসারে ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন অন্নবস্ত্রের ক্লেশে সর্ব্বদাই লাঞ্ছিত, সেই সংসার শীঘ্রই সমুচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। যে সংসারে রমণীগণ পূজিত, ও অস্খলিত দাম্পত্য প্রেম পরিলক্ষিত হয়, সেই সংসার নিখিল গার্হস্থ্যসুখের আধার হইয়া, কমলানিলয় রূপে পর্য্যবসিত হয়। ইত্যাকার উপদেশ সংহিতাকারের মনস্বিতার পরিচায়ক, আমরা ইহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। ৫ম, দণ্ডবিধি। দণ্ডবিধিস্থলে ব্যবস্থাপক আবার যুনানীস্থ ড্রেকোর ন্যায় অতীব রুক্ষভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন।

ষষ্ঠ, রমণীগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। এই স্থলে ব্যবস্থাপক বলিয়াছেন যে রমণীগণ সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিবেন, ধনব্যয়ে অমুক্তহস্তা হইবেন, স্বামী কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিলেও কখনও কলুষিতা হইবেন না। তাঁহাদিগের পৃথক যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই, পতিশুশ্রূষাই তাঁহাদিগের স্বর্গলাভের মুখ্য উপায়। পতির মৃত্যুর পর তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তাঁহারা সন্তানহীনা হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই। আপন ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিতে সক্ষম হইবেন। এতদ্দৃষ্টে হৃদবোধ জন্মে যে মনু বিধবা-বিবাহের পক্ষসমর্থনকারী নহেন. তাঁহার মতে পতির পরলোক গমন হইলে পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু তিনি আবার পৌনর্ভব নামক এক প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন, যদ্দৃষ্টে তাঁহার সময়ে যে বিধবাবিবাহ একবারে অপ্রচলিত ছিল না ইহা বুঝিতে পারা যায়। যথা—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া,
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব
উচ্যতে ॥ ৯ ; ১৭৫ ॥

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা স্ত্রী অন্যের ভার্য্যা হইয়া, উহার দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র কহে। ৭ম, স্ত্রীধন পরিরক্ষণ। নষ্টপতি অনাথ বালকদিগের ধনের ন্যায় বন্ধ্যা বিধবা প্রভৃতি অসহায় রমণীদিগের ধন পরিরক্ষণ করিবেন; ইংরাজের ব্যবস্থা যে অতীব কল্যাণকর তাহা আমরা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছি। যাহা হউক, উপসংহার কালে বলিতে হইতেছে যে এই সংহিতা মধ্যে অনেক উদার ও কল্যাণজনক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। যদিও স্থানে স্থানে ব্যবস্থাপকের মতের সঙ্কীর্ণতাও পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কোন স্থলে বা ব্যবস্থাপকের মতের উদারতা, কোন স্থলে বা সঙ্কীর্ণতা, এবং স্থলে স্থলে স্বমতের অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সংহিতা গ্রন্থ খানি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক দ্বারা সঙ্কলিত বলিয়া আশঙ্কা করেন। কিন্তু এই দুরবগাহ প্রশ্নের মীমাংসা মাদৃশ জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। পুরাতত্ত্ববিদ্ সুধীগণই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করিবেন।

শীতে সুন্দরী !

পৌষের দারুণ শীতে মহিষের শৃঙ্গ,
মাঘে বাঘ কাঁপে থর থর অনিবার।
উদীচী পবন বহে ক্ষুরধার যেন
তুষার বরষি অঙ্গে পরশে সতত;

তাহে নিশা ঘোররূপা, আকাশ মলিন,
বাষ্পজালে অস্ফুট কি, তারকানিকর
দীপশিখা-দীপাবলী প্রায় মিট মিট
করিতেছে ; জীবজন্তু শীতে জড়সড়,
কার মুখে নাহি রব, রহি রহি শিবা
ভীষণ বিরাবে, শুনি আতঙ্ক উদয়
হৃদয়ে, গৃহস্থগৃহে ধূমাবলী চাহে
উঠিতে গগনোপরি, কিম্বা বাহিরিতে ;
দুরন্ত হিমের ভয়ে মাথা তুলিবারে
নারে ; রহে শূন্যদেশে বাঁধিয়া জমাট
স্থিরভাবে,—মেঘাকারে ; কিম্বা পথচয়
রোধ করি। হেনকালে কোন যুবা
বাহিরের কাজ সারি গৃহে সমাগত
শীতার্ত্ত, যেখানে তাঁর হৃদয়মোহিনী
নবীনা প্রেয়সী রূপে নাশি তমচয়
গৃহের, ভাবনশীলা "কতক্ষণে নাথ
আসিবেন গৃহে ফিরি, সুখেতে বঞ্চিব
শীতের শর্ব্বরী।" যুবা আঘাতিল দ্বার
সেইক্ষণে ; ফেলি বাল্য গাত্র আবরণ,
নিমিষে খুলিল দ্বার হাসিতে হাসিতে।
"মুখেতে ধরেনা হাসি, এত খুসি কেন ?
শীত বুঝি ভয় পায় রমণীর দাপে ?
দেখ দেখি ! বুড়া আমি ম'সু শীতে হিমে ;
মম কম্প দেখি নাকি এত হাসি হাসে ?"
কহিল যুবক, গৃহে প্রবেশ করিয়া
যুবতীর হাসি দেখি জড়িতবচনে,
দাঁতে দাঁত লাগিতেছে অতি তীক্ষ্ণ শীতে।
উত্তরিল কলস্বরে কোকিল-গঞ্জিনী,
সুহাসিনী,—"তাই বটে ! বুড়া নয়ত কি ?
কোন যুবা শীতে কাঁপে, অভ্যাসুতপ্রায়
নবমীর দিনে ? নাথ থাকিলে রক্তের
তেজবিন্দু শীতে কিছু করিতে কি পারে ?
সে কথা এখন থাক, হও সুস্থকায় ;
এসো এবে ব'সো ত্বরা কোমলশয্যায়
প্রক্ষালি বদন খানি উষ্ণ বারি দানে।
হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া বসিল যুবক ;
যুবতী ব্যাপৃতা হয় খাদ্য সংস্কারে
অনল পরশি। যুবা প্রেয়সীর অঙ্গে
আয়তি-নিশান-হেতু বলয় যুগল
ভিন্ন আভরণ কিছু না দেখি, হৃদয়ে
অনুভবি ব্যথা, তবে কহিতে লাগিল।
"কেন প্রিয়ে, ও বরাঙ্গ শূন্য আজ দেখি
চাঁদেতে চন্দ্রিকা কিম্বা মেঘেতে দামিনী,
গোলাপে সুবর্ণ কিম্বা কমলে সুরভি
না দেখিলে কার মনে সুখ হয় ধনি ?
তব পতি ধনহীন তাহা মানি আমি,
কিন্তু বল বিধুমুখি ! কার আছে এত
তোমার যতেক আছে মণিমুক্তা সোণা ?
ত্যজিয়াছ কেন ? যাহে আমি সুখ পাই,
তাহা কি করিতে তব উচিত না হয় ?"
পতিমুখে শুনি সতী এতেক ভারতী
কহিলা বিষাদে, "নাথ, আমিও তা জানি
বস্ত্র অলঙ্কারে দাসী সাজিলে তোমার
হয় সুখ। কিন্তু বঁধু, বল দেখি শুনি
মায়ের দুর্দ্দশা, দেখি কোন্ সতী মেয়ে
হৃদয়ে না পায় ব্যথা!? মার সুখে সুখী ;—
মার দুখে দুখী সখে, না হব কেমনে ?
দস্যুর পীড়নে মাতা ভূষাহীন দেহ,—
বিষাদে মলিনা ম্রিয়মাণা সদা তিনি।
বড় মানুষের মেয়ে মোর সে জননী ;—
অনন্ত বিভব তাঁর পিতার ;—রতন-
ভূবন-ভাণ্ডার যত পান পিতৃ কাছে ;—

লুঠিয়াছে সে তস্কর। আজ মা আমার
কাঙ্গালিনী ;—আভরণ-বসন-বিহীনা।
তা দেখে আপন অঙ্গে কেমনে ধরিব
বসন-ভূষণ, নাথ, তাই আজ তাপি
মনস্তাপে, ত্যজিয়াছি সে সব দূরেতে।"
"কি বল! প্রেয়সি,"বলি যুবা আরম্ভিল
প্রতিবাক্য, "কবে হেন দুর্দৈব ঘটিল
তব পিতৃগৃহে? সতি, আমিত না জানি
সে সম্বাদ? বল নাই কেন সুলোচনে?
দেখিয়া আসিতে আমি পারিতাম তব
জননীরে নিজ চক্ষে। তুমি বা কেমনে
দেখিলা তাঁহারে?" শুনি, সে চন্দ্রবদনী
ঈষৎ হাসিয়া তবে পুনঃ উত্তরিলা ;—
"তুমিও দেখিছ নিতি নিতি জননীর
সে দশা,—জানহে নাথ, সকল সম্বাদ।
আমি সদা উপবিষ্ট তাঁর অঙ্কদেশে,—
কভু না করেন তিনি নয়নের আড়
আমারে, এতই স্নেহ তাঁর কন্যা প্রতি।
যে চোরে লুঠেছে তাঁর রতন ভাণ্ডার,—
সামান্য সে দস্যু নয়;—যার পরতাপে
ভীষণ তস্কর ভীত ;—ক্ষিতির হৃদয়
বিদারিত ; গতিহীন অপ্ জড় ভাব
তুষার আকারে, তেজ হিমাঙ্গ ; মরুৎ
মনমরা রসহীন ; ব্যোম সে বিষণ্ণ—
আচ্ছন্ন সতত ভয়-বাষ্প-আবরণে ;—
তার নাম শীত। কাড়ি লইয়াছে তাঁর
হরিত বসন শিল্প-নির্ম্মিত সুন্দর,
যাহার তুলনা নাই এ মহীমণ্ডলে,—
তাহার তুলনা সেই বসন আপনি।
ওড়না—আঙ্গিয়া, বহু-তরু-লতা-পত্র-
বিনির্ম্মিত বহুচিত্র কুসুম খচিত ;—
কুসুমের গন্ধে বর্ণে জনমনঃ হরে।
যাহার আদর্শে শিল্পী, হরিত সাটিন্
নানা ফুল কাটা নির্ম্মি ধনীর নিকট
বহু ধন পায় পারিতোষিক স্বরূপ।
আভরণ কথা আমি কহিতে না পারি,
বর্ণিতে পারে বা কোন কবি ধরাতলে
আছে হেন ; শিল্পকর কেহ বা এমন
আছে তার অনুকারী, বিচিত্র ভূষণ
লতিকা-ওষধি-দল-ফুল-ফলময়
হরেছে সে সব,—শীত ভয়ঙ্কর চোরে।
মা আমার মনোদুঃখে নীরব সতত—
কোকিল-পাপিয়া-শুক-শারী মরালিনী
কণ্ঠ এবে রুদ্ধ। নেত্রে অশ্রুধারা বহে
সতত শিশির রূপে। সেই বসুমতী
বসুহীনা আজি ;—শীত দস্যু দুষ্টাচারে
সতীর জননী সেই ধরিত্রী কামিনী—
সীতা-প্রসবিনী। সেই সীতা বড় দিদি
মম;—মাতা বসুন্ধরা, জান নাকি তাহা
প্রাণেশ্বর, বল শুনি কেমনে ধরিব
আভরণ অঙ্গে, ভাল বসন পরিব?"
ভাবিনীর ভাবময়ী ভারতী শুনিয়া
অবাক যুবকবর ;—বচন না সরে
কিছু ক্ষণ। পরে যুবা কহিলা উল্লাসে
"শীতের প্রভাবে ধরা হয় শোভাহীন,
স্বভাবের গতি ইহা জানে সর্ব্ব জন,—
দেখে সবে প্রতি বর্ষে ; মিথিলানগরে
জনকের যজ্ঞভূমি কর্ষণ সময়ে
হলের সীতায় জন্মে রাম-মনোরমা ;
পৌরাণিক বাক্য—তাহা শুনে সর্ব্বজনে
সদা কাল ; বসুধারে মাতা বলি সবে
সম্বোধে সতত মুখে। কিন্তু কভু নাহি

দেখিয়াছি হেন স্বপ্ন—হেন কাব্যময় ভাব রাশি, কোন খানে। কার মুখে শুনি নাহি কভু। ধন্য! তব অনুভূতি কাব্যময়ী চিত্তহরা। ধন্য! স্বামিপ্রিয়ে, তব কাব্য-উদ্যানের ফুল-ফুল-মধু-বিন্দু, লোভী ক্ষুদ্র অলি তোষ মধু দানে।"

বুঝিবার ভুল।

অর্থ সম্বন্ধে।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে আহার-সম্বন্ধে লোকের কেমন বুঝিবার ভুল হয়, তদ্বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়াছিলাম। এবারে অর্থসম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ যে বুঝিবার ভুল আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

পাঠিকাগণ হয় ত মনে করিতেছেন, অর্থসম্বন্ধে আবার বুঝিবার ভুল কি? তাঁহারা হয় ত ভাবিতেছেন আমরা বাজে খরচ সম্বন্ধে দুই চারিটা উপদেশ ঝাড়িব। আমরা কিন্তু সে দিক্ দিয়াও যাইব না। অর্থ জিনিসটা কি, সেই সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে কুসংস্কার আছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য ও দূর করিবার জন্য এত বাগাড়ম্বর।

অর্থ, এই কথাটী বলিলেই অনেকের কল্পনা চক্ষের সমক্ষে শ্বেত বা হরিদ্রা বর্ণের কতকগুলি পদার্থ চক্‌চক্ করিতে থাকে। তাহার মধ্যে কতকগুলি গোলাকৃতি; যথা, দুয়ানি, সিকি, আধুলি, টাকা, গিনি, মোহর। কতকগুলি শরীরের অঙ্গ বিশেষ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকারের; যথা, বালা, চুড়ি, ইয়ারিং হার, চিক, মাকড়ি ইত্যাদি। মোটের উপর অধিকাংশই বৃত্তাকার ধারণ করিয়া তাহারা যে বাস্তবিক কিছুই নহে (শূন্য মাত্র), তাহাই প্রমাণ করিতেছে। সাদা কথায়, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত পদার্থ-মাত্রেই সাধারণতঃ অর্থ বা ধন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। পয়সাও যে এই দলে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। অন্য পদার্থের মধ্যে কেবল টাকার প্রতিনিধি ব্যাঙ্ক নোট ও কোম্পানির কাগজ সম্মানে তাহাদের সমকক্ষ। যাহার ঘরে যত টাকা কড়ি ও সোণা রূপার জিনিস অধিক আছে, যাহার যত ব্যাঙ্ক নোট ও কোম্পানির কাগজ আছে, সেই তত ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বাড়ী, জমি, আসবাব প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থের অধিকারীকে লোকে এই মনে করিয়া ধনী বলে, যে ঐ সকল বাড়ী, জমি বা আসবাব বিক্রয় করিলে টাকা পাওয়া যায়। এই জন্য সাধারণতঃ ধন বা অর্থ বলিলে টাকা কড়িই বুঝায়। এক জনের বিষয় কত? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে এত হাজার, বা এত লক্ষ, বা এত

কোটী টাকা। সকল প্রকার আয় ব্যয়ে সকল প্রকার লাভ লোকসানে, লোকে যাহা দ্বারা ধনী বা দরিদ্র বলিয়া বিবেচিত হয়, তৎসমুদায়ের গণনা টাকাতেই হইয়া থাকে। সত্য বটে, লোকের সম্পত্তির হিসাব ধরিবার সময় তাহার টাকা কড়ির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান্ জিনিস পত্রও ধরা হয়; কিন্তু তাহার কারণ এই যে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে টাকা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য যাহাই হউক না কেন, যদি উহা অধিক টাকায় বিক্রীত হয়, তাহাহইলে উহার অধিকারী অধিক ধনী বলিয়া বিবেচিত হন, বিপরীত পক্ষে তিনি তৎপরিমাণে অল্প ধনী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। অথচ তাঁহার জিনিস যাহা তাহাই আছে, তাহার বৃদ্ধি হয় নাই, হ্রাসও হয় নাই। টাকা তুলিয়া রাখিলে যে ধন বৃদ্ধি হয় না, ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে যে টাকা খাটাইতে হয়, এ কথা কেহ অস্বীকার করেন না ইহা সত্য, এবং সেই জন্য লোকে বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া টাকা দিয়া জিনিষ ক্রয় করে এবং টাকা লইয়া জিনিস বিক্রয় করে। কিন্তু ব্যবসায়ী এই মনে করিয়া দ্রব্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করেন যে উহা বিক্রয় করিলে আবার অর্থ পাওয়া যাইবে, এখন যাহা খরচ করা হইল, তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া যাইবে। ব্যবসায়ীর ঘরে যদিও সকল সময় নগদ টাকা অধিক থাকে না, জিনিস পত্রই অধিক থাকে, তথাপি ব্যবসায়ী ঐ সকল জিনিসকে ধন বলিয়া মনে করেন এই জন্য, যে উহা বিক্রয় করিলে টাকা আসিবে। কারবার তুলিয়া দিবার সময় লোকে সমুদায় মালপত্র বিক্রয় করিয়া টাকাতে পরিণত করে, এবং যতক্ষণ তাহা না করা হয়, ততক্ষণ কারবারের অর্থ হাতে আসিল বলিয়া মনে করে না। যথার্থ অর্থ বা ধন কাহাকে বলে লোকে সাধারণতঃ তাহা বুঝে না;- টাকা পয়সা, সোণা রূপাকেই একমাত্র ধন বলিয়া মনে করে। বুঝিবার ভুলের ইহা একটী উত্তম দৃষ্টান্ত।

গার্হস্থ্য সঙ্গীত।

(গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত।)

এই প্রবাস ভবন,
তোমার প্রদত্ত নাথ, প্রিয়দরশন।
সংসারের পথশ্রান্ত,পাপ ভারে ভারাক্রান্ত,
তাপিত মস্তক কোথা করিব স্থাপন;
করি তাই কৃপাবিধান,করিলে এ ছায়াদান,
তোমার করুণা যেন ভুলি না কখন।
যত দিন রাখ হেথা, প্রাণপণে সর্ব্বথা,
তব প্রীতি প্রিয়কার্য্য করিব সাধন;

নিত্যব্রত নিত্যধর্ম্ম, এই জীবনের কর্ম্ম,
সাধিতে সতত যেন করি প্রাণপণ।
মোহ মায়ার ছলনে, তোমারে যেন ভুলিনে,
রেখো দেব মন প্রাণ সদা সচেতন;
তব ইচ্ছা হবে যবে, আনন্দে ত্যজি এ ভবে'
নিত্যধামে তব ক্রোড়ে করিব গমন।

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড ডফরিণ ব্রহ্মদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ইনকম ট্যাক্স আইন বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার কুষ্ঠরোগীদিগের আশ্রমে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজ মুমূর্ষু কুষ্ঠরোগীদিগের স্বতন্ত্র বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দান করিয়াছেন।

৩। কাশ্মীরের মহারাজ কলিকাতার বিজ্ঞানসভায় ৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৪। মহারাণী পার্লেমেণ্ট খুলিবার দিনে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহার সার এই:—

"বিদেশীয় রাজগণের সহিত আমার বন্ধুতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আফগান সীমা লইয়া রুষ-রাজের সহিত আমার যে বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা এখন সন্তোষজনকরূপে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে; রুষ-গবর্ণমেণ্টের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তদনুসারে সীমা কমিসন এখন সীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন। আমার বিশ্বাস এই, সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলেই মধ্য আসিয়ায় শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

"রোমেলিয়ার গোলযোগ নিবারণে আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহাতে আমার দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। রোমেলিয়ার অধিবাসিগণের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কোনওরূপ বন্দোবস্ত করা কি সুলতানের মূল স্বত্বের হানি করা আমার অভিপ্রায় নয়।

"তুরুস্কের সুলতানের সহিত আমার যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তদনুসারে মিসরে বিশেষ কমিশনর প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা মিসর-রাজের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে মিসর সুরক্ষিত হইতে পারে ও শাসন-প্রণালীর সুবন্দোবস্ত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করিবেন।

"নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমি ব্রহ্ম-রাজ থিবর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পর হইতেই তিনি আমার প্রজাবর্গ ও আমার ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার গর্হিত আচরণে আমি আমার

দূতকে তাঁহার দরবার হইতে উঠাইয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; তৎপরে আমি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করি কিন্তু তিনি তাহাও অবহেলা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ-প্রজার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমি বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থ নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-রাজের এই সমস্ত কার্য্যকলাপে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ব্রিটিশ প্রজার জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে ও ব্রহ্মদেশের তৎকালিক অরাজকতা দূর করিতে হইলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। জেনেরাল সার হ্যারী প্রেণ্ডারগাষ্টের অধীনস্থ আমার ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের বীরত্বে ব্রহ্মদেশ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বশীকৃত হইয়াছে। আমি স্থির করিয়াছি যে ব্রহ্মদেশ চিরদিনের জন্য আমার ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়াই ব্রহ্মদেশে শান্তি ও সুনিয়ম সংস্থাপনের একমাত্র প্রশস্ত উপায়।

"আমি অনেক দিন হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। যে ঘোষণা দ্বারা আমি শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কিনা তাহার তথ্যানুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে।

"বাণিজ্য ও কৃষির কোন উন্নতি হয় নাই দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।

"আয়র্লণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত করিবার জন্য পুনরায় যে চেষ্টা হইতেছে তাহা দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের সম্মিলনের বিরুদ্ধাচরণ আমার নিকট সম্পূর্ণ অপ্রীতিকর।"

৫। ইংলণ্ডের মন্ত্রিদলের আবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রক্ষণশীল দল পদত্যাগ করাতে উদারনৈতিকদলের নেতা বৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠন করিতেছেন।

বামাগণের রচনা।

পাষাণ।

পাষাণের যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, মানব! তাহা হইলে তুমি আজ জগৎ সমক্ষে, পুস্তকের পাতে, কথোপকথন স্থলে, বক্তৃতার বাক্যে গলা ফুলাইয়া অন্যের নিষ্ঠুরতা দোষ কীর্ত্তন করিবার সময় বলিতে পারিতে না—"উঃ অমুক ব্যক্তি কি নিষ্ঠুর! তাহার হৃদয় পাষাণনির্ম্মিত!" পাষাণ বিদীর্ণ হয়, মানব-হৃদয় কখনও বিদীর্ণ হইতে দেখিয়াছ কি? মানব মন প্রতিনিয়ত আত্মসুখের দিকে ধাবিত; রোগ, শোক, ক্ষোভ, ভয় ও নৈরাশ্য মন-নদের ভোগ

ও বিলাস সন্ধানোৎসুক খর স্রোতের নিকট সামান্য তৃণ গাছির ন্যায় প্রতিবন্ধক মাত্র। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, নিজের শরীর ও মনকে ভোগ বিলাসের ও স্বার্থানুসন্ধানের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলি, একমাত্র সন্তানই পিতা মাতার সুখ, শান্তি ও সম্পত্তি ; অশনে, ভ্রমণে, শয়নে, স্বপনে তাঁহাদের হৃদয়পটের স্নেহপুত্তলী ও গৃহসরসীর প্রফুল্ল পঙ্কজ স্বরূপ। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বস্বই সন্তান। সেই সন্তান আমরা কি না পিতামাতার মৃতদেহ চিতানলে দগ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনানন্তর, অল্পদিনের মধ্যেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা পিতামাতাকে বিস্মৃতি নীরে বিসর্জ্জন দিয়া নিজের সুখানুসন্ধানে যত্নশীল হই। দেখিলে, আমরা কি কৃতজ্ঞতার ধার ধারি! যদি ধারিতাম, তবে পিতামাতার চিতাগ্নিতে অঙ্গ ঢালি না কেন ; অথবা সেই চিতানল হৃদয়ে ধারণ না করিয়া, সেই শ্মশান ভূমি আবাসস্থল না করিয়া, অট্টালিকা ও দাস দাসীর প্রয়াসী হইয়া জীবন কাটাই কেন?

কুমুদিনী—বিদ্যানন্দ কাঠী।

নিদ্রা।

ওহে পিতঃ! তব দয়া অনন্ত অপার,
কত রূপে কত ভাবে করিছ প্রচার!
নিদ্রারূপে দয়া তব করি বিতরণ,
কর মানবের দুঃখ ক্ষণেকে হরণ।
নিদ্রা বিনা মানবের কি দশা হইত,
দিবানিশি দুঃখানলে হৃদয় জ্বলিত,
নিদ্রাসুধা প্রাণে তাই কর বরষণ,
তাহার পরশে মোরা হই বিচেতন।
সে সময় সুখ দুঃখ বোধ পরিহরি,
নিদ্রা-সুকোমল-কোলে শান্তি ভোগ করি।
দুঃখের তাড়নানলে যদি নরচয়,
সুখময়ী নিদ্রাপদে লয় হে আশ্রয়,
কোলেতে করিয়া লন যেমতি তনয়,
মাতৃকোলে যেন শিশু সুস্থচিত রয় ;
পরিশ্রান্ত হয়ে শক্তি হারাইয়া নরে,
অবসাদে অঙ্গ ঢালি দেয় ভূমি পরে।
সে সময় নিদ্রা দেবি প্রসারি স্বগুণ,
পুনরায় দেন শক্তি করি চতুর্গুণ।
পুত্রের শোকেতে যবে ব্যথিত হৃদয়,
কাতরে জননী পড়ি থাকেন ধরায়,
কাহার নাহিক সাধ্য সে দুঃখ হরিতে,
নিদ্রা হতে পারে সেই ক্ষণেক ভুলিতে।
শোকানলে দগ্ধ হয়ে অসহ্য যাতনা
ভুলে হায়! যতক্ষণ থাকে না চেতনা।
পতির বিরহে সতী শোকে প্রাণ দহে,
দুঃখবারি উচ্ছলিত হৃদয়েতে বহে,

বোধহীন শোকে, প্রাণ বিনাশে উদ্যত,
সেজনও স্থির হয় হয়ে নিদ্রাগত।
আরামদায়িনী আর নিদ্রা সম নাই,
এমন সুখের বস্তু বল কোথা পাই?
ওহে পিতা নিদ্রাসুখ দিয়া পৃথিবীতে,
রেখেছ মানবগণে হরষিত চিতে।

শ্রীবসন্তকুমারী বসু।
মিকশিখিন—খুলনা।

অর্দ্ধস্ফুট ফুল!

(১)

আসে যবে হাসি হাসি মধুরা যামিনী,
গগন বিভাসি যবে হাসে নিশামণি,
ছোট ছোট তারাগুলি, করি যবে গলাগলি,
কি জানি কিসের কথা করে কানাকানি,
বিলাস উল্লাসে যবে উড়ে চকোরিণী;
অনন্ত ফুটন্ত ফুল চাহি চাঁদ পানে
বিতরে সুরভিধন মৃদু সমীরণে।

(২)

তখন অরধ ফুল্ল কুসুমের কলি!
কি তোর মনের কথা? আধ প্রাণ খুলি
কারে কও কেবা শুনে? কার প্রিয় সম্ভাষণে
পড় ঢুলে লতা-কোলে সোহাগে উছলি?
প্রকৃতি মূরতিখানি রূপেতে উজলি?
বল মোরে, মাথা খাও, কর না ছলনা
কার্ প্রেমে এত ভাব? অস্ফুট যৌবনা!

(৩)

দেখিলে ও হাসিমাখা চারু মুখখানি
উল্লাসে উছলে প্রাণ কেন তা না জানি।
জানি না কেন যে তোরে, সখী ভাবে সমাদরে,
সম্ভাষিতে সদা সাধ করে লো সজনী!
চোখে চোখে রাখি তোরে দিবস রজনী।
মরমের কথা সই ক'স প্রাণ খুলে,
আমিও মনের কথা বলি লো বিরলে।

(৪)

বড় সুখে আছ সই স্বপনেও তোরে,
বিষম চিন্তার ছায়া পরশিতে নারে;
উল্লাসে আপন মনে, প্রীতি, সরলতা সনে
বিজনে করিছ কেলী প্রকৃতি আদরে,
কুটিল সংসার পাপ পশে না অন্তরে,
পেয়েছ লো অতুলিত সুরূপের ডালি
তবুত গরব নাই, সুহাসিনী কলি!

(৫)

অতুল যৌবন কান্তি আধ বিকশিত,
আধ লাজে, আধ হাসে, প্রীতি-উছলিত,
একবার চেয়ে দেখি, তোমাতে সকলি সখি!
গরব, চাতুরী, প্রেম ছলনা-পূরিত,
পুনঃ দেখি কিছু নাই বালিকা-চরিত।
এই ছাই পোড়া হল, এই সরলতা!
না জানি কি দিয়ে তোরে গড়েছে বিধাতা।

(৬)

বল্‌না সজনি! তোরে কই কানে কানে,
সাজিতে হয় কি সাধ প্রফুল্ল যৌবনে?
প্রফুল্ল ফুলের কোলে, দেখি প্রিয় অলিকুলে,
হয় কি বাসনা বিরাজিতে অলি সনে?
শিখিতে প্রেমের ছলা সরল জীবনে?
ওকি সই! মাথা নেড়ে "না কেন বলিলে
আমার মনের কথা কেমনে বুঝিলে?

(৭)

ছি ছিঃ সই এ সুখের সময়ের সাথে
ঘৃণা হয় যৌবনের তুলনা করিতে।
এখন মনেতে ভাই! মলা মাটী কিছু নাই,
সকলই বিশ্বাসময় যা কিছু জগতে,
লাজ, ভয়ে, সমভাব, নারী পুরুষেতে,
এ সীমা হইলে পার, পড়িবি পাথারে,
কত ঢেউ প্রতিঘাত করিবে অন্তরে।

(৮)

তাই বলি বড় সুখে আছ লো সজনি!
করে না ব্যাকুল তোরে মধুকরধ্বনি,
অনিল আদর তোরে, বিচলিত নাহি করে
সরল উদার প্রাণ, বিজনবাসিনী!
আপন মনের সুখে হাসিছ আপনি।
সোহাগ, গরব, মান, আদর, চাতুরী,
সব সম, নিরুপম কুসুম সুন্দরী!

(৯)

অরধ যৌবন ছায়া অর্দ্ধ কিশোর,
নাই লো সজনি হেন সুরূপের ওর,
তাই লো জগৎ আঁখি, তোরে হেরি হয় সুখী,
বাসনা, চিত্রিয়া রাখি কান্তিখানি তোর,
সুচারু হাসির রাগ, সৌন্দর্য্য বিভোর,
নাই পরিণাম চিন্তা হলাহলময়
অনন্ত সংসারে তোর সব সুখময়।

(১০)

সজনি লো! আঁখিভোরে তোর সুখ দেখি
বাসনা, অনন্ত কাল ঐ সুখে থাকি;
এ সীমা হইয়া পার, যেন নাহি যাই আর,
বালিকা কলিকা হেন চিরদিন থাকি
ঐ সরলতা টুকু প্রাণে প্রাণে মাখি,
সমীর আদর, অলি-মধুর গুঞ্জন,
করিতে না পারে যেন বিচলিত মন।

(১১)

কিন্তু সই! সময়ের অবিরাম গতি,
নিবারিতে নাহি পারে অখণ্ড নিয়তি;
পলে পলে ধীরে ধীরে, এ সুখ পলাবে দূরে,
রবে না লো চিরদিন এ কিশোর মতি,
অচিরে সাজিতে হবে নবীনা যুবতী।
তাও কি সে দশা সই চিরদিন রবে?
সময়ে যৌবন কান্তি, তাও ফুরাইবে।

(১২)

(তাই বলি)
হাস সই! প্রাণভোরে সুমধুর হাঁসি
প্রীতিমাখা হাসি টুকু বড় ভালবাসি,
মধুর জ্যোৎস্না সখী, মৃদু পরশনে মাখি,
নাচলো মনের সাধে, সৌন্দর্য্য বিকাশি,
রবে না লো খোলা প্রাণ পোহাইলে নিশি,
রূপে, রসে, লাজে, ভয়ে, সাজিবে যুবতী,
কি করিবে প্রাণ সই কালের নিয়তি!!

(১৩)

(কিন্তু)
ভগিনি! একটী কথা থাকে যেন মনে,
পেয়েছ সৌন্দর্য্য হেন যাঁর কৃপাগুণে,
যাঁর দয়া বৃন্ত কোলে, সতত সোহাগে পালে
ভুলনা সে প্রেমময় করুণানিধানে,
রেখ মন, ভক্তি ডোরে বাঁধি সে চরণে,
মধুপ গুঞ্জন ছলে ক'র গুণগান,
শিশিরের ছলে পদে প্রেমাশ্রু প্রদান!!

[শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী মল্লিক।
অগ্রদ্বীপ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৪ সংখ্যা।	ফাল্গুন ১২৯২—মার্চ্চ ১৮৮৬।	৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্রহ্মরাজ পত্নী বিয়োগ—ব্রহ্ম-রাজ থিব আপনার প্রাণটী রক্ষার জন্য বিনা যুদ্ধে ইংরাজহস্তে রাজ্য সম্পদ সমর্পণ করিয়া বন্দীর শৃঙ্খল পরিধান করেন। এখন তাঁহার জীবনে সুখ কি? তাঁহার মহিষী তাঁহার কারাগারের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, একটী মৃত পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া তিনি স্বয়ং মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম থিব অপেক্ষা তাঁহার পত্নী বীরপ্রকৃতি ছিলেন, তাই তিনি আপনার ও সন্তানের জন্য চিরদাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে ইংরাজ রাজপুরুষ-দিগের চিরকলঙ্ক। থিব ইংরাজের শরণাগত হইয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার মহিষী পূর্ণগর্ভা, কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়। বিজয়ী ইংরাজ পদাশ্রিত জনের সুখ দুঃখ বুঝিবেন কেন? তাঁহার করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন কেন? আমরা যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, বিশেষ অপমান ও কষ্ট প্রদান করিয়া রাজপরিবারকে প্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। এরূপ অবস্থায় মহিষীর অপঘাত মৃত্যু হইবে আশ্চর্য্য নহে।

ব্রহ্মজয়ে ভারতের লাভ—আমরা মনে করিয়াছিলাম বহু মূল্য কাষ্ঠ ও ধাতুর আকর ব্রহ্মরাজ্য জয় হইল, এবার ভারতের অবস্থা সচ্ছল হইবে। কিন্তু তাহার প্রথম ফল ভয়ঙ্কর ইন্‌কম ট্যাক্স

ভারতবাসীদিগের স্কন্ধে স্থাপিত হইল। ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়ও ভারতকোষ হইতে গৃহীত হইবে। ব্রহ্মদেশ শাসনের জন্যও অতিরিক্ত ব্যয় ভারতকে যোগাইতে হইবে।

ষ্টেড সাহেবের অভ্যর্থনা—ইংলণ্ডের সুনীতি-সংরক্ষক ষ্টেড সাহেবের কারামুক্তির দিন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক মহাসভা আহূত হয়, তাহাতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ও মহিলাও সমবেত হন। ২৭ হাজার স্ত্রীলোক এক এক পেনী করিয়া দিয়া ২৭হাজার পেনীর এক তোড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ষ্টেড সাহেবকে উপহার দেওয়া হয়। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত একটী লোকের জন্য সাধারণের কতদূর সহানুভূতি, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। ষ্টেড সাহেবও তাঁহার বক্তৃতায় ধর্ম্মবীরোচিত সাহস ও ধীরতার যুগপৎ পরিচয় দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডাল—বঙ্গ,বোম্বাই,মান্দ্রাজ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষার্থিনীদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রদত্ত এক একটী স্বর্ণ মেডাল পুরস্কার পাইবেন। এতদ্ভিন্ন রাজ-প্রতিনিধি ৫টী রৌপ্য মেডাল দিবেন, তাহা আগ্রা, বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও লাহোর মেডিকাল স্কুলের হসপিটাল-সহকারিণী ছাত্রীদিগকে প্রদত্ত হইবে। লেডী ডফরিণের শুভোদ্‌যোগের এই প্রথম সুসংবাদ।

ময়মনসিংহে বিধবাবিবাহ-আন্দোলন—বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রচলনার্থ ময়মনসিংহে এক বৃহতী সভা হয়, রাজা সূর্য্যকান্ত ও বাবু জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমিদারদ্বয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রত্যেক জেলায় এরূপ আন্দোলন প্রার্থনীয়।

আলীগড়ে সমাজসংস্কার সভা—সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী মালবারী স্বয়ং পারসী হইয়াও হিন্দু সমাজের কল্যাণ জন্য প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে আলীগড়ে যে সভা হয় রাজা জয়কিষণ দাস বাহাদুর তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সভায় ৩টী প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে:—(১) বাল্যবিবাহ নিবারণ, আবশ্যক হইলে এতদর্থে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ, (২) অসম বয়সের বিবাহ নিষেধ, (৩) মালাবরীর কার্য্যের সহকারিতার জন্য একটী কমিটী স্থাপন।

বার্ত্তাবহ কপোত—ফরাসী জর্ম্মণ যুদ্ধের সময় কপোত দ্বারা দূরস্থানে যুদ্ধসংবাদাদি আদান প্রদান হইয়াছে। আমেরিকায় এই কৌশলের আবার উন্নতি হইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে

আর্গো নামে এক কপোত ফুরিডা হইতে নিউইয়র্কে প্রায় হাজার মাইল উড়িয়া আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার এই পক্ষী ৫০০ মাইলের অধিক দূর ভ্রমণ করিয়াছে। ইহা বেলজিয়মের কপোতবংশ হইতে উৎপন্ন। এরূপ পক্ষী তারের খবরের কার্য্য করিতে পারে।

ব্রহ্মদেশীয় রোমশ পরিবার—ব্রহ্মরাজ থিবকে লক্ষ টাকা দিয়াও এই পরিবারকে কেহ হস্তগত করিতে পারে নাই। এক্ষণে ইহারা রেঙ্গুনে আনীত হইয়াছে এবং শুনা যায় সমস্ত পৃথিবীতে প্রদর্শিত হইবে। ইহারা দুইটী জীব—মাতা ও পুত্র সন্তান। মাতা অপেক্ষা সন্তান চতুর।

"অমৃতে অরুচি কার?"

এ কথা বলিতেও ভাল, শুনিতেও ভাল। কিন্তু অল্প লোকে এই কথার অর্থ বুঝিয়া ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগিনি! প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, অমৃত বলিয়া কোন জিনিষ এ পৃথিবীতে আছে কি না? পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কথা শুনিয়াছ। দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অবশেষে এক ভাণ্ড অমৃত উঠিল, তাহা পান করিয়া দেবতাগণ অমর হইয়া গেলেন। অমৃত ত সেই বস্তু, যাহা পান করিলে আর মৃত্যু হয় না, ইহা নিত্য বস্তু, ইহা পাইলে নিত্য জীবন ও নিত্য সুখ লাভ হয়। সংসারে সে বস্তু কি? গৃহ অলঙ্কার ধন মান খাদ্য পরিধেয় পৃথিবীর যে কিছু সুখের বস্তু, সকলি ত অনিত্য, তাহাদ্বারা অমৃতের আশা কোথায়? তাই ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী স্বামি-প্রদত্ত বিত্ত বিভবে বীতস্পৃহ হইয়া বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহাদ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? "মৃত্যোর্মামমৃতং গময়" মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও। মৈত্রেয়ী বুঝিয়াছিলেন অমৃত কি এবং সেই অমৃতেতে তাঁহার রুচি হইয়াছিল বলিয়া তিনি সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর এক মাত্র সত্য বস্তু, অমৃত বস্তু এবং তাঁহার ভজনা সাধনা একমাত্র সত্য বস্তু ও অমৃত বস্তু, ভাগ্যবান ভাগ্যবতী নর নারী এই অমৃতের জন্য লালায়িত হইয়া তাহা লাভ করেন ও তাহাদ্বারা আপনাদিগের জীবনকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ নর নারীর রুচি প্রবৃত্তি কোন্ দিকে? এই পৃথিবীর

চাকচিক্যময় বস্তু, এই সংসারের আশু সুখকর পদার্থ লাভ করিবার জন্যই কি তাহারা ব্যস্ত নহে? সুতরাং তাহাদিগের রুচি মৃত্যুর জন্য, অনিত্য সুখের জন্য। "অমৃতে অরুচি কার?" না বলিয়া "অমৃতে রুচি কার?" তাহাদিগের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করাই সঙ্গত। অমৃতে অরুচি ত সকলেরই, আমার, তোমার, পৃথিবীর সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ৯৯৯ জনের অমৃতের দিকে দৃষ্টি নাই, অনিত্য সুখ সম্পদের জন্যই প্রাণ হাহাকার করিতেছে। "অমৃতে রুচি কার?" দেখ, কাহার নিকট হইতে ইহার সদুত্তর পাও? মৈত্রেয়ী তাঁহার অমৃতস্পৃহার জন্য যে ভারত নারী-কুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন দেখ সেই নারীগণের অধিকাংশের রুচি কত নীচ ও মলিন। বেশ বিন্যাস, অলঙ্কার, সুসজ্জিত গৃহ, দাস দাসী, যান, বাহন, মান মর্য্যাদা, প্রভুত্ব, শারীরিক সুখ ও সৌন্দর্য্য এই সকল কি অধিকাংশের লক্ষ্য নয়? যাঁহারা সংসার ভিন্ন কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। যাঁহারা দান ধর্ম্ম ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগেরই বা আকাঙ্ক্ষা কি? "আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।" হে ভগবতি! আয়ু দেও, যশ দেও, সৌভাগ্য দেও। কি আশ্চর্য্য, ধর্ম্ম করিতে গিয়াও অমৃতের জন্য রুচি হয় না, নীচ সংসারের সুখের প্রার্থনাই আসিয়া থাকে। লোকে সামান্য কথায় বলেন যে শরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান যাইবে, সেই শরিষার ভিতরে যদি ভূত থাকে, তবে আর উপায় নাই। যে ধর্ম্ম দিয়া অনিত্য বাসনা দূর করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মের মধ্যেই যদি অনিত্য কামনা থাকে, তবে আর আশা ভরসা কোথায়?

হে ভগিনি! আপনার জীবনের অবস্থা ভাবিয়া দেখ আর বল "অমৃতে অরুচি আর কাহার আছে না আছে জানি না, কিন্তু অমৃতে অরুচি আমার।" এই অরুচি দূর করিতে হইবে। আহারে অরুচি দূর না হইলে যেমন শরীরের স্বাস্থ্য ও উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অমৃতে অরুচি দূর না হইলে সেইরূপ আত্মার জীবন, উন্নতি, কল্যাণ ও সুখের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর মনুষ্যের আত্মাকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, যার তাহাতে রুচি ও অনুরাগ সেই তাহা পায়। সকল নর নারী অমৃতের ভিখারী হইয়া তাহারই জন্য প্রার্থনা কর এবং দেবজীবন লাভ করিয়া অনন্ত সুখে সুখী হও।

বাক্‌পুষ্টা ।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া নারী কাশ্মীরপতি মহারাজ তুঞ্জীনের মহিষী ছিলেন। বাক্‌পুষ্টা পতির সহিত ধর্ম্মাসনে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পতির সহায়তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তুঞ্জীন সেই ধর্ম্মশীলা পত্নীর পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করিতেন না। অন্যান্য গৃহিণীর কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সঙ্কীর্ণ, কেবল আপনার গৃহকার্য্য ও কতিপয় মাত্র পরিজনের প্রতিপালনেই সীমাবদ্ধ,রাজ-গৃহিণীর কার্য্যক্ষেত্র সেরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহার হস্তে অগণ্য পরিজনের ও অসংখ্য প্রজার প্রতিপালনের ভার, যাঁহাকে বিভিন্নপথাবলম্বী কোটি কোটি লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইবে, যাঁহার বিবেচনার উপর একটি বিশাল রাজ্যের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে, তাঁহার ধৈর্য্য, বীর্য্য দয়া, দাক্ষিণ্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পবিত্রতার প্রভাব কিরূপ হওয়া উচিত, বাক্‌পুষ্টা তাহারই একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সেই রাজা ও রাজ্ঞী স্বল্পকালমধ্যে সমস্ত প্রজার হৃদয় অধিকার করিলেন। এ সংসারে বিপদ ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেমন অগ্নি কাঞ্চনের পরীক্ষাস্থান, তেমনি বিপদই ধার্ম্মিকের পরীক্ষাস্থান। দৈবঘটনায় তাঁহাদের সেই কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। যেন তাঁহাদের চরিত্রপরীক্ষার জন্যই প্রজামধ্যে এক দুঃসহ দৈব-বিপদ উপস্থিত হইল। একদা ভাদ্রমাসে, যখন সমস্ত কেদারমণ্ডল পাকোন্মুখ শালিশস্যে সমাচ্ছন্ন, তখন কাশ্মীরে অকস্মাৎ ঘোর তুহিনপাত হইতে লাগিল। অচিরেই দেশের সমস্ত শস্য হিমানীগর্ভে নিমগ্ন হইল, সেই সঙ্গে প্রজার জীবনাশাও বিনষ্ট হইল। ক্রমে রাজ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষানল প্রজ্জলিত হইল।

একটি সন্তান পীড়িত হইলে তাহার শুশ্রূষা পিতামাতার পক্ষে কিরূপ গুরুতর তাহা একবার ভাবিয়া দেখ; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, যাঁহাদের হস্তে অসংখ্য পীড়িতের শুশ্রূষার ভার,তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরুতর। এক্ষণে সেই রাজদম্পতীর হস্তে দুর্ভিক্ষপীড়িত অনন্ত প্রজার প্রাণরক্ষার ভার পতিত হইল। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার উঠিয়াছে; অনাহারে দিন দিন শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; তদ্দর্শনে রাজা ও রাজ্ঞী বিপত্তিহারী ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রজারক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। গৃহে, অরণ্যে, পথে, শ্মশানে, আশ্রমে, কান্তারে, আপণে, নদীতটে, যে যেস্থানে অনাহারে পতিত, তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখে অন্নজল প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিষী, শত

শত নিরন্নকে অন্ন দিবার জন্য এককালে যেন শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; প্রজারা যেন এক অন্নপূর্ণার অসংখ্য রূপ দর্শন করিতে লাগিল।

প্রজার জন্য বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রমে রাজকোষ নিঃশেষিত হইল, ক্রমে রাজার ও মন্ত্রিগণের সঞ্চিত অর্থ সকলি নিঃশেষিত হইল। হায়! দৈববলের সহিত মানববল কতক্ষণ যুঝিতে পারে; শেষে সকল উপায়ই ফুরাইল। মহিষী প্রজার জন্য গাত্রের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিলেন, পরিধেয় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রজার অন্ন ক্রয় করিলেন। পুত্রপ্রাণা জননী যে বেশে মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে করে, মহিষী শেষে সেই সর্ব্বত্যাগিনীর বেশে আলুলায়িত কেশে গৃহে গৃহে অন্নমুষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। পিতা মাতা অপত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, জায়া পতি দাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, ভ্রাতা ভগিনী সোদরপ্রেম বিস্মৃত হইল। সকলেই স্বোদরপূরণে উন্মত্ত। দেশের শূর, বীর, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত, তাহাদেরও আর মনুষ্যের আকার নাই, সকলে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট; উৎকট জঠরজ্বালায় জ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকট কটাক্ষপাত করিতেছে, এক মুষ্টি অন্ন লইয়া মাতাপুত্রে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছে। সমস্ত দেশ যমপুরীর ন্যায় ঘোরদর্শন প্রেতবৃন্দে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সেই লোমহর্ষণ ভীষণ সময়ে, প্রগাঢ় নিশীথকালে, একদা যখন সমস্ত রাজভবন নিঃশব্দ, নরপতি শয়নকক্ষে সহসা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার গভীর আর্ত্তনাদে গৃহভিত্তি সকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহিষী শান্তিকামনায় ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, পতির রোদন শুনিয়া অমনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা শোকোন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"দেবি! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় না। নিশ্চয় আমারি দোষে নিরপরাধ প্রজালোকের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমারি ভাগ্যদোষে আজি ধরণী অন্নশূন্যা হইয়াছেন। যাহা কিছু উপায় ছিল সকলি বিফল হইল; নিদারুণ কালের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইল। দুরন্ত দাবানলে বারিবিন্দুর ন্যায় আমাদের সমস্ত যত্ন লয় পাইল। দেখ! চক্ষের উপর কত শত মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে; শিশুসন্তানগুলি মাতার বিবশ বাহুপাশ হইতে স্খলিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ক্ষুধার্ত্তের সকরুণ প্রার্থনা, কোথাও রোগার্ত্তের যাতনাময় চিৎকার, কোথাও শোকার্ত্তের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ, কোথাও মুমূর্ষুর অন্তিমকাতরতা, আমার সেই অমরাবতী কাশ্মীর আজি মহাশ্মশান হইয়াছে। কেহ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, তাহারও পথ

নাই; হিমসংঘাতে চারিদিকের পাহাড় পর্ব্বত অলঙ্ঘ্য, পথ ঘাট সকলি রুদ্ধ; এস্থান হইতে নির্গমন করা মনুষ্যশক্তির অতীত। সূর্য্যদেব যেন রসাতলে প্রবেশ করিয়াছেন, ঘোর ঘনঘটায় দশদিক নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেন শত শত কালরাত্রি আসিয়া ঘেরিয়াছে। তরু-কোটরের দ্বার রুদ্ধ হইলে তন্মধ্যে বিবশ পক্ষিশাবকদিগের যে দশা হয়, আমার প্রজাগণেরও সেই দশা উপস্থিত। হে দেবি! যাহারা আমার প্রাণের উপাদান, আমি সেই প্রিয়তম প্রজাগণের এ দুর্গতি আর দেখিতে পারি না; আমি জলন্ত হুতাশনে এ দেহ আহুতি দিব। ধন্য সেই নরপালগণ! যাঁহারা প্রাণাধিক প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ দেখিয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যান। হা দেবি! জানি না কি মহাপাপে আমরা সে সুখে বঞ্চিত হইলাম।" নরপতি ইহা কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মহিষীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতি আবির্ভূত হইল, তিনি যেন কোন দিব্য শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেন। তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া পরম যত্নে পতির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর, স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিলেন। সেই নিশীথ নির্বাত কক্ষমধ্যে দীপসকল স্তিমিতভাবে জলিতেছিল, অকস্মাৎ সে সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, যেন মহিষী কি বলিবেন শুনিবার জন্যই গ্রীবা উন্নত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মহিষী কহিলেন,—"নাথ! আপনি নিতান্ত অধীর ও দুর্ব্বলচিত্তের ন্যায় এ কি কথা কহিতেছেন। এ সময় আপনারও কি চৈতন্যলোপ হইল? প্রবল ঝটিকায় সামান্য তরুর ন্যায় মহাশৈলও যদি বিচলিত হয়, তবে ক্ষুদ্রে আর মহতে প্রভেদ কি? এ জগতে অসাধ্যসাধনেই যদি সমর্থ না হইলেন, তবে নাথ! ভবাদৃশ মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়? কোন্ পিতা মুমূর্ষু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে? যেমন পতির প্রতি ভক্তি পত্নীর একমাত্র ব্রত, তেমনি প্রজার প্রতি অনুরাগ রাজার একমাত্র ব্রত; যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে আমাদিগকে অটলভাবে সেই ব্রত পালন করিতে হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতি-লাভ কাপুরুষেরি কার্য্য; যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যতক্ষণ এরাজ্যে একটিও মহাপ্রাণীর প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। অবশেষে যখন তাহারও জীবনাশা নির্ব্বাণ হইবে, আমরা উভয়ে সেই শবকঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া অনশনে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বদনজ্যোতি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল, নয়নদ্বার হইতে তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল, মহিষী বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন,—"হে ধর্ম্মবীর!

উঠুন! উঠুন! হে প্রজাপালক! আর ভয় নাই। আমি যদি যথার্থ পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি প্রজার দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দ্রব হইয়া থাকে, আমি যদি সত্যের সাধনা ও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি, তবে কার সাধ্য আমার কথার অন্যথা করে; হে প্রজানাথ! আপনার প্রজাগণের আর দুর্ভিক্ষভয় নাই"। অহো! পতিব্রতার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা! এ সংসারে ঘটনাচক্রের কি আশ্চর্য্য গতি! মহিষী ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করিয়া সেই কথা বলিবামাত্র অকস্মাৎ শূন্যমার্গ হইতে ভূরি ভূরি মৃত কপোত পতিত হইতে লাগিল। রাজা আশ্চর্য্য মানিয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন। প্রজারা প্রত্যহ সেইরূপ মৃত কপোত ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল,—"জগদীশ্বর মহিষীর অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া সকলের প্রাণরক্ষার এই অদ্ভুত উপায় বিধান করিলেন।" আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে পরমানন্দে জগৎ-পিতার অপার মহিমা এবং সেই পুণ্যবতী রাজ্ঞীর গুণাবলী গান করিতে লাগিল।

দিন দিন মহিষীর পুণ্যরাশি অজস্র-ধারায় বহিতে লাগিল, ঈশ্বরের কৃপায় আকাশমণ্ডলও ক্রমে সুপ্রসন্ন হইল। যথাকালে বসুন্ধরাও প্রচুর শস্যরত্ন প্রসব করিলেন।

ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রজাবৎসল মহারাজ তুঙ্গীন পরলোক গমন করিলেন। পতিব্রতা বাক্‌পুষ্টা প্রজা-মণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পতির সহগমন করিলেন। সেই পুণ্যশীলা যে স্থানে মৃত পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "বাক্‌পুষ্টাটবী" নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে।

অসভ্যজাতির বিবরণ।

অষ্ট্রেলিয় জাতি।

আসিয়ার মানচিত্রের দক্ষিণে যে একটী বৃহৎ দ্বীপ দেখা যায়, তাহার নাম অষ্ট্রেলিয়া বা নবহলণ্ড। পৃথিবীর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দ্বীপ এবং আকারে প্রায় ইউরোপ খণ্ডের সমতুল্য। এই দ্বীপের অনেক স্থান এখন ইংরাজ-দিগের অধিকৃত এবং ইংলণ্ড হইতে যাহারা দায়মাল আসামী হইয়া এখানে দ্বীপান্তরিত হইত, তাহাদিগকে লইয়া এখানে বৃহৎ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হইতেছে। অল্পদিনের মধ্যে এই দ্বীপ একটী সভ্য ভূখণ্ড হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই দ্বীপবাসী অসভ্যজাতি সভ্য জাতির সংস্পর্শে অল্পসংখ্যক হইয়া ক্রমশঃ লোপপ্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের ইতিহাস একেকালে বিলুপ্ত না হয়, ইহা বাঞ্ছনীয়। এখনও তাহারা সংখ্যাতে অনেক এবং অনেক বংশ ও শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদিগের আচার ব্যবহারে আমোদ প্রমোদে আদিম মনুষ্য জাতির ইতিবৃত্ত অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এই জাতির কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বর্ণন করিতেছি।

অষ্ট্রেলিয় জাতির আকৃতি কিছু অদ্ভুত। ইহাদিগের মাথা বড়, কিন্তু পদদ্বয় শীর্ণ। উরু, হাঁটু এবং পার গোছে মাংস নাই বলিলেই হয়। ইহাদিগের বৃহদাকার মস্তকে ভ্রূদ্বয় উন্নত, এবং তাহার মধ্যে চক্ষু গভীররূপে স্থাপিত। নাসিকা চ্যাপটা এবং হাঁ বড়, দেখিতে রাক্ষসের মত ভয়ানক, কিন্তু সচরাচর ইহাদিগের স্বভাব ততদূর নৃশংস নহে। ইহাদিগের মস্তকের চুল পরিষ্কার থাকিলে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় দেখায়, কিন্তু ইহারা মাটী ও আটা দিয়া প্রায় তাহাতে জট পাকাইয়া রাখে। চুলের রঙ বালকদিগের কিছু কটা, কিন্তু বয়স্কদিগের প্রায়ই কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের শরীরের রঙ তাম্রবর্ণ হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হাত ও পায়ের পাতা ছোট ও সুগঠিত, স্কন্ধ ও বক্ষদেশ প্রশস্ত ও মাংসল। অল্পাধিক এই সকল লক্ষণ দ্বারা অপরাপর জাতি হইতে অষ্ট্রেলিয়দিগকে সহজে চিনিতে পারা যায়।

এই জাতি সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্যে অনভিজ্ঞ। ইহাদিগের মধ্যে কৃষিকার্য্য নাই এবং ইহারা কোন প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে না। যন্ত্রের মধ্যে ইহাদিগের কয়েক খানি সামান্য অস্ত্র পাথরের মুদ্গর এবং মোটামুটি গঠনের ঝুড়ি ও জাল আছে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সমুদ্রতীরবাসী তাহারাও ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বে কোন প্রকার নৌকা গঠন করিতে জানিত না। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা নাবিকতায় পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত ছিল তাহারা হয় গাছের বাকলের দুই ধার দড়ী দিয়া বাঁধিয়া অথবা কতকগুলি শর ও কাটি একত্র করিয়া তদ্দ্বারা জলপথে গমনাগমন করিত। তাহাদিগের বাসের জন্য স্থায়ী গৃহ বা কুটীর নাই। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উলঙ্গ। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশবাসীরা কেবল শীতকালে অপোসম নামক জন্তুর চামড়ায় এক প্রকার চাদর করিয়া স্কন্ধে জড়াইয়া থাকে। অনেক বংশের প্রথা আছে, তাহারা সম্মুখের দুই একটী দন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে এবং চামড়ার উপর দুই একটী স্থায়ী চিহ্ন দাগাইয়া লয়। অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় তাহারা নানা প্রকার বর্ণে আপনাদিগের শরীর রঞ্জিত করে এবং ঝিনুক, শামুক, পলা ইত্যাদি গাঁথিয়া গহনা পরিধান করে। কিন্তু

এ দেশে অনেক সুন্দর সুন্দর পক্ষী থাকিলেও তাহাদিগের পালক ইহাদিগকে পরিধান করিতে দেখা যায় না।

অষ্ট্রেলিয় জাতির ভাষা এক মূল হইতে উৎপন্ন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ইহাতে এরূপ দেখা যায় যে এক বংশের কথা ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আর এক বংশ কিছুমাত্র বোধগম্য করিতে পারে না। তাহাদিগের ধর্ম্মের ভাব অতি স্থূল এবং তাহা কুসংস্কারে পরিণত। তাহারা পাপ-পুরুষের বড় ভয় করে। তাহাদিগের বিশ্বাস এই ব্যক্তি অমানুষিক দেহ ও শক্তি ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। রাত্রিকালে সে জঙ্গলের মধ্যে শিকার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, অসাবধান কোন পথিককে পাইলে আক্রমণ করিয়া ধরে, তাহার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের নিকট লইয়া যায় এবং [তাহাতে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। এই ভূতের গাত্রে আগুন ফেলিয়া দিতে পারিলে সে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়। এই বিশ্বাসে অষ্ট্রেলিয় কোন লোক রাত্রিকালে একটী জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড সঙ্গে না লইয়া ঘরের বাহির হয় না।

মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থানে আসিতেও ইহারা বড় ভয় পায়। তাহার বিষয় ইহারা কিছুমাত্র বলিতে চায় না, বড় পীড়াপীড়ি করিলে ফুস্ ফুস্ করিয়া চুপে চুপে যা কিছু বলিয়া থাকে।

ইহাদিগের মধ্যে ডাইনের বড় প্রাদুর্ভাব, তাহারা বয়লিয়া নামে অভিহিত। সকল লোকেই তাহাদিগকে ভয় করে ও তাহাদিগের অভিপ্রায় মতে কার্য্য করে। ইহাদের বিশ্বাস ডাইনেরা দৈববলে বলী, ইচ্ছামতে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতে পারে এবং অপর বয়লিয়া ভিন্ন অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না। কাহারও উপরে ইহাদিগের রাগ থাকিলে রাত্রিকালে অদৃশ্যভাবে আসিয়া ইহারা তাহাকে আক্রমণ করে ও তাহার মাংস দগ্ধ করিয়া দেয়। যাহা হউক অপর বয়লিয়া মনে করিলে এই ডাইন ছাড়াইতে পারে এবং যাদু বিদ্যাদ্বারা ইহার কৃত অনিষ্টও নিবারণ করিতে পারে।

আমেরিক, মালয়, নিগ্রো প্রভৃতি অসভ্যজাতির [ন্যায় অষ্ট্রেলিয় জাতিরও বিশ্বাস যে বয়ঃস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয় না। এই বিশ্বাস হইতে ঘোরতর কুসংস্কার ও তাহার মহানিষ্টকর ফল উৎপন্ন হয়। পীড়াতে কোন বংশের কোন লোকের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয়েরা মনে করে, অপর বংশের ডাইন চাপিয়া তাহাকে মারিয়াছে, সুতরাং তাহারা সেই কল্পিত হত্যাকারীকে বা তাহার নিকটসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে যতক্ষণ হত্যা করিতে না পারে, ততক্ষণ সুস্থির হইতে পারে না।

এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে অষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ যুদ্ধ ঘটনা হয়।

বংশের যে লোকের মৃত্যু হইল তাহার আত্মীয়গণ বৈরনির্যাতনের জন্য উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগের দলস্থ লোকদিগকে একত্র করে এবং কি করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে পরামর্শ করে। সাধারণের মতে এরূপ স্থলে যুদ্ধ করাই স্থির হয়, তখন বিপক্ষ-দলের নিকট যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ লইয়া এক দূত প্রেরিত হয়। তাহারাও বন্ধু ও প্রতিবাসীদিগকে একত্র করিয়া পরামর্শ করে এবং সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এক এক দলে ৫০ হইতে ২০০ ব্যক্তি জড় হয় এবং তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পরস্পরকে নিন্দা ও কটূক্তি করিতে থাকে। পরে যুদ্ধারম্ভ হয়। উভয় দলের বিলক্ষণ কৌশলজ্ঞান আছে, বিপক্ষের অস্ত্র এড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহাতে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলে, কোন প্রাণহানি হয় না। পরে এক দলের একটী লোক মরিলেই (কখন কখন তৎপূর্ব্বেও) যুদ্ধ স্থগিত হইয়া যায়। তখন আবার পরস্পরের উপর নিন্দা, কটূক্তি ও গালিবর্ষণ হয়। কিছুক্ষণ পরে বিবাদ মিটিয়া যায় এবং উভয় দলে বন্ধু-ভাবে মিলিত হইয়া মৃতদেহ সমাহিত করে ও একত্র নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় অষ্ট্রেলিয়েরা বড় নৃত্যগীতপ্রিয়। তাহাদিগের গান অতি সংক্ষিপ্ত, দুই একটী ভাব দু এক কথায় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। কেহ রাগোন্মত্ত হইলে অমনি এই বলিয়া গান ধরে—

বিঁধ্‌ব তার পেট,
বিঁধ্‌ব তার চোখ,
বিঁধ্‌ব হৃদয় তার রে—

এই বলিয়া অস্ত্র শাণাইতে বসে। গান করিতে করিতে আরও উত্তেজিত হইয়া শূন্যে বর্শা ঘুরাইতে থাকে এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে যেন যুদ্ধ করিতেছে এই রূপ দেখায়। তাহার স্ত্রী প্রভৃতি থাকিয়া থাকিয়া অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনার্থ এইরূপ সুর ধরে—

হাড় ভাঙ্গা বেটা
পা নড়নড়ে টা,
চামসে হাঁটু, নড়ে ভোলা।

দর্শকেরা বাহবা দেয়। রাগোন্মত্ত ব্যক্তি গান গাইয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া করিয়া একটা নৃত্যের উদ্যোগ করে।

অষ্ট্রেলিয় কোন ব্যক্তি ভয়ার্ত্ত হইলে সাহসের গান গায়, ক্ষুধার্ত্ত হইলে গান গাইয়া উদরের জ্বালা নিবারণ করে; ভরা পেট হইলে যদি বেহুঁস হইয়া না পড়ে, খুব উৎসাহের সহিত গান গাইতে থাকে। বস্তুত ইহারা সকল অবস্থাতেই গান গাইয়া বল ও সান্ত্বনা লাভ করে। ইহাদিগের গান অনেক প্রকারের, কিন্তু সকল গুলিই সংক্ষিপ্ত ও উত্তেজনার ভাব-প্রকাশক। গান গাইয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে প্রতিহিংসায় উৎসাহিত করে। চারি পাঁচ জন দুষ্ট স্ত্রীলোক মনে করিলে এইরূপ গানে ৪০।৫০ জন পুরুষকে অনায়াসে

নাচাইয়া তুলিতে পারে, এবং তাহাদিগের দ্বারা যে কোন প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারে। গানের সহিত ইহারা অশ্রুপাত ও আর্ত্তনাদ করিয়া মানুষদিগকে পাগল করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

দেশীয় নৃত্যের মধ্যে করিবরী অতি প্রসিদ্ধ। ইহা রাত্রিকালে হইয়া থাকে। নর্ত্তকদিগের শরীর শ্বেতবর্ণে চিত্রিত হয় এবং তাহা এরূপ বিচিত্র করা হয় যে দুই ব্যক্তিকে ঠিক একরূপ দেখায় না। অন্ধকারে এ দৃশ্য বড় চমৎকার! গুপ্ত স্থান হইতে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শাদা ভূত সকল একে একে বাহির হইতেছে, আর গায়ক ও বাদকেরা অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া গাইতেছে ও তালে তালে বাজাইতেছে, ইহাতে দৃশ্যাভিনয়ের একশেষ দেখা যায়। প্রথমে দুই ব্যক্তি ধীরে ধীরে তাহাদিগের বাহু ও হস্ত নাড়িতে নাড়িতে দেখা দেয়, তৎপরে অন্যেরা একে একে যেন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িতে আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যায়। তখন প্রত্যেকে দুই পা যত দূর সাধ্য ছাড়াছাড়ি করিয়া দাঁড়ায়, মাথাটী একটা স্কন্ধের উপর নত করে, চক্ষু জল জল করিতে থাকে, সকলেই একদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, বাহুগুলি উত্তোলন করিয়া মস্তকের দিকে নত করে, হস্ত দ্বারা কোন প্রকার অস্ত্র ধারণ করে। তখন নৃত্য বা লম্ফ আরম্ভ হয়, নর্ত্তকেরা চক্রার বাদ্যের তালে তালে প্রত্যেক লম্ফে ঠিক আধফুট করিয়া সরিয়া যায়; এবং প্রথম ব্যক্তি যে পথ দেখায়, সকলে এক লাইনে সেই দিকে যায়। অধিক স্থান থাকিলে এবং নর্ত্তকদিগের সংখ্যা অধিক হইলে তাহারা দুই তিন লাইন করিয়া নাচিতে থাকে এবং প্রথম লাইন বাম দিকে যতটা সরে, দ্বিতীয় লাইন দক্ষিণ দিকে ততটা যায়, ইহা দেখিতে বড় সুন্দর। বাদ্যের সহিত নর্ত্তকেরা ক্রমে অধিক উত্তেজিত হইয়া নাচিতে থাকে, উচ্চতম সীমায় উঠিয়া নৃত্য হঠাৎ এককালে থামিয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়েরা কয়েকটী প্রধান প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত, যথা বালায়োক, টন্দনদারপ, গোটক ইত্যাদি; এক গোষ্ঠীর সকলেই এক নামে অভিহিত। দুইটী বিখ্যাত নিয়ম দ্বারা এই পারিবারিক নাম সকল স্থায়ী ও সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হয়,—(১) কোন ব্যক্তি তাহার পারিবারিক নামের অর্থাৎ সগোত্রা স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে পারে না। (২) সন্তান বালক বা বালিকা হউক, মাতার পারিবারিক নাম তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক গোষ্ঠী কোন জন্তু বা বৃক্ষকে পারিবারিক নিদর্শনরূপে গ্রহণ করে এবং সে গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তি সে জন্তুকে বধ বা সে বৃক্ষকে আঘাত করিবে না।

অষ্ট্রেলিয়দিগের মধ্যে বিবাহ একটী অতি সামান্য অনুষ্ঠান। স্ত্রীলোককে

ইহারা অস্থাবর সম্পত্তির মত জ্ঞান করে এবং ইচ্ছামতে তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে বিক্রয় বা দান করে ও তাহার নিজের মতামতের কোন অপেক্ষা করে না। পরিবারের এক ভ্রাতা মরিলে অন্য ভ্রাতা তাহার ধন সম্পত্তির সহিত তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণেরও স্বত্বাধিকারী হয়।

বাদুড় জাতি।

বাদুড় আকাশে উড়িয়া বেড়ায় বলিয়া অনেকে ইহাকে পাখী বলে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। পাখীর সহিত বাদুড়ের কোন সৌসাদৃশ্য নাই। না ইহার গায় পালক আছে, না ইহা ডিম পাড়ে, না ইহা গিলিয়া খায়। বাদুড়ের আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে বরং মানুষের দলে ইহাকে গণনা করিতে হয়। পিট কাপড়ের মত বাদুড়ের পিটে যে পাতলা চামড়া খানি যোড়া আছে, তাহাই বাতাসের উপর বিস্তার করিয়া ইহা উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু এই পিট-কাপড় খুলিয়া লইলে বাদুড় দেখিতে ঠিক একটী ক্ষুদ্র মনুষ্যশিশুর মত। বাদুড়ের কঙ্কাল বা হাড়ের কাটামা খানিও দেখিতে মনুষ্যের কঙ্কালের মত। মানুষের মত বাদুড় সন্তান প্রসব করে, সন্তানকে স্তনপান করায় এবং খাদ্য সকল কামড়াইয়া অথবা চুবিয়া খায়। ইহাকে শাপভ্রষ্ট মনুষ্য মনে করিলে করা যাইতে পারে।

বাদুড় ঈশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি, ইহা পক্ষী নয় উড়িয়া বেড়ায়, মনুষ্য নয় অথচ আপনার মূর্ত্তিতে মনুষ্যের অবিকল অবয়ব দেখাইয়া থাকে। এই বাদুড় জাতি আবার নানা দেশে নানা প্রকার স্বভাব চরিত্র ধারণ করিয়া মানবচরিত্রের বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইউরোপ খণ্ডে বাদুড় অতি শান্ত নিরীহ জীব, ইহা অনিষ্টকর কীট সকল ভক্ষণ করিয়া কৃষকের চাষ কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই বাদুড় ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সেখানে তাহাদিগের আকার অতি বৃহৎ হয় এবং প্রকৃতি উগ্রভাবাপন্ন হইয়া থাকে। বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগের অনেকে উড্ডীয়মান শৃগালের কথা পড়িয়াছেন, সেই শৃগাল আর কেহ নহে, এই বাদুড়েরই রূপান্তর মাত্র। যাবাদ্বীপে এই শ্রেণীর বাদুড়দিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। ভারত দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানেও ইহাদিগের নিতান্ত অভাব নাই। দক্ষিণে ভাণ্ডিমান দ্বীপ এবং উত্তরে জাপান, ইহার মধ্যে ইহাদিগকে অধিক দেখা যায়। ইহারা শস্যক্ষেত্রে ও উদ্যানের অত্যন্ত অনিষ্ট করে এবং যাহা সম্মুখে পায়,

তাহাই আহার করে ও নষ্ট করে। ইহারা কেবল রাত্রিকালে আহারান্বেষণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় না, কখনও কখনও উদরজ্বালায় দিনের বেলায়ও বাহির হয়। আমাদিগের দেশেও উদ্যান সকলে বাদুড়ের দৌরাত্ম্য কম নহে।

কিন্তু আমেরিকায় Vampin বা রক্ত-শোষক নামে যে এক জাতীয় বাদুড় আছে, তাহাদিগের মত নৃশংস ও ভয়ঙ্কর জীব অতি অল্প দেখা যায়। ইহাদিগের নাসিকার ছিদ্রের উপর কোমল চর্ম্মের এক আবরণ আছে, তাহা গুটাইয়া রক্তশোষক নলের মত করা যায়। শুনা যায় ইহারা নিদ্রিত মনুষ্য বা জন্তুর শরীরে এই নল সংলগ্ন করিয়া তাহার রক্ত-শোষণ ও ভক্ষণ করে। ইহাদিগের আবার চাতুরী কৌশল এমন, শিকারের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, এজন্য পাখাদ্বারা বাতাস করিতে থাকে এবং সেই সময় রক্ত চুষিয়া খাইতে থাকে। ইহাতে অনেকের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইহারা কেবল নিদ্রিত নয়, জাগ্রত জন্তুকেও আক্রমণ করে। আমেজন নদের নিকট এক রাত্রি জ্যোৎস্নার রাত্রে তাঁহার অশ্ব সকলকে চরিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি দেখিলেন কতকগুলি বাদুড় ঘোড়াদিগের উপর আসিয়া বার বার বসিতেছে, ঘোড়ারা তাহাতে কোন বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে না। পর দিন প্রাতে দেখিলেন, অশ্ব সকলের স্কন্ধদেশ হইতে ক্ষুর পর্য্যন্ত রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহারা দন্ত বা নখরাঘাতে রক্ত বাহির করে, তাহা নিশ্চিত অবধারিত হয় নাই কিন্তু তাহারা যে ছিদ্র করে, তাহা ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব সহজে থামান যায় না।

ওয়ালেস নামে এক সাহেব দুই বার এই বাদুড় দ্বারা আহত হন। তিনি বলেন রাইও নিগ্রোর নিকট এক অশ্বরক্ষাকীকে প্রতি রাত্রে বাদুড়ে দংশন করিত। সে যে গৃহে শয়ন করিত, তাহাতে ৫। ৬ ব্যক্তি থাকিলেও বাদুড় বাছিয়া বাছিয়া তাহাকেই ধরিত। আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের একটী বালিকাকে এইরূপ বাদুড়ে প্রতি রাত্রে দংশন করিত, তাহাতে তাহার শরীরের রক্ত নিঃশেষিত হইয়া মৃত্যুর উপক্রম হয়, অবশেষে তাহাকে এক দূর স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে প্রাণ রক্ষা পায়।

দক্ষিণ আমেরিকার রাইও ফ্রানসিস্কো নদীতীরস্থ চূর্ণ প্রস্তরের গহ্বরে ও পারিমী পর্ব্বতের ফাটালে অসংখ্য বাদুড় থাকে, তাহারা গো-মেষাদি পশুকে কামড়াইয়া অস্থির করে। তাহাদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃষকেরা পশু সকল স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তাহারা ক্ষেত্রে গন্ধক ও তমাক জ্বালাইয়া দেয়, তাহার ধোঁয়াতে নেশাগ্রস্ত হইয়া হাজার

হাজার বাদুড় ভূতলশায়ী হয়, তখন কৃষকেরা লগুড়াঘাতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

কতকগুলি বাদুড়ের জিহ্বা মস্তকের সমান লম্বা এবং কাটঠোকরার জিবের মত কাঁটাযুক্ত, ইহাদ্বারা তাহারা গুপ্ত স্থান হইতে কীট সকল সহজে বাহির করিয়া থাকে।

বাদুড়দিগের দন্ত, ওষ্ঠ, নাসারন্ধ্র, মস্তক, পাখা ও লাঙ্গুলের ভিন্ন ভিন্ন গঠন অনুসারে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা জঙ্গল ও পাহাড়ের এমত গুপ্ত স্থান সকলে বাস করে যে ইহাদিগের সকলের সন্ধান করিয়া উঠা দুষ্কর। এক সিংহল দ্বীপে ১৬ শ্রেণীর বাদুড় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই শ্রেণী এই দ্বীপ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বাদুড় কত অসংখ্য শ্রেণীর বুঝা যাইতে পারে। সিংহল দ্বীপের বাদুড়দিগের আবার একটী বিশেষত্ব এই যে তাহাদিগের অনেকের চর্ম্ম পক্ষীর পালকের ন্যায় উজ্জ্বল, পীত, পাটল, রক্তিম প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত, সুতরাং ইহাদিগকে এ দেশের বাদুড়দিগের ন্যায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া যাইতে হয় না।

আমাদিগের গৃহের চামচিকা বাদুড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হয়। ইহাদিগের আকৃতি ও গঠন বাদুড়ের মত। ইহারা গৃহ অপরিষ্কার করে ও দুর্গন্ধ জন্মায়, কিন্তু ইহাদিগকে বাদুড়ের মত দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া বোধ হয় না।

বাদুড়ের ন্যায় আরও কতকগুলি স্তনপায়ী জন্তুও উড়িবার শক্তি পাইয়াছে। একজাতীয় কাঠবিড়াল আছে, তাহাদিগের পৃষ্ঠে চর্ম্মের আচ্ছাদন হস্তদ্বয়ের সহিত পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে। ইহারা শূন্যমার্গে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে এবং ৩০। ৪০ হাত লম্ফ দিতে বা উড়িয়া যাইতে পারে। ইহারা মাটীর উপর ভাল করিয়া দৌড়িতে পারে না কিন্তু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে অতি সত্বর চলিয়া যাইতে পারে। ভারত দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কোন কোন চতুষ্পদের এইরূপ উড্ডয়ন শক্তি আছে। আরও কত স্থানে কত জন্তুর এইরূপ অদ্ভুত গঠন আছে, কে বলিতে পারে?

মধুর।

১

মধুর—যখন সুনীল আকাশে,
ছড়ায়ে কিরণ পূর্ণ চাঁদ হাসে;
ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী মৃদু-মন্দ গতি
চলে নাচি নাচি সাগরের আশে;
গায় প্রেমগীত মনের উল্লাসে।

২

মধুর—যখন গভীর নিশীথে,
আসে বংশী-ধ্বনি নাচিতে নাচিতে;
কৃষক যখন, আনন্দে মগন,
বাজায় বাঁসরী প্রিয়ারে তুষিতে,
ডুবাইতে প্রাণ প্রণয়ের গীতে।

৩

মধুর—যখন জোছনা-সাগরে,
ভাসিয়া পাপিয়া সুমধুর স্বরে,
গায় প্রাণ খুলি, উচ্চে কণ্ঠ তুলি,
সুস্বর-লহরী জগতে বিতরে,
মন প্রাণ মরি, লয় যেন হরে।

৪

মধুর—যখন জাল-রন্ধ্র দিয়া,
মধুর চন্দ্রিকা গৃহে প্রবেশিয়া,
নিদ্রায় মগন রমণী বদন
সাজায় সুন্দর; প্রাণনাথ তার
শত চক্ষু হয়ে হেরে অনিবার।

৫

মধুর—যখন উষার সময়,
কুলায়ে বসিয়া বিহগ নিচয়,
নয়নখুলিয়া, কভু বা মুদিয়া,
মধুর কূজনে জগত জাগায়,
প্রভাতী সঙ্গীত হরষেতে গায়।

৬

সে সঙ্গীতে জাগি যবে সাধু জন
পরব্রহ্ম নাম করেন কীর্ত্তন;
পরাণ খুলিয়া, সুতান তুলিয়া,
গান প্রেমভরে "জয় দয়াময়,"
সে মধুর ডাকে পাষাণ (ও) গলায়।

৭

মধুর—যখন প্রদোষ-গগন
সাজে নানা সাজে—নয়ন-রঞ্জন;
জলদের দল—সতত চঞ্চল,
নানা বেশে সদা করে বিচরণ,
বিচিত্র মুরতি করে প্রকটন।

৮

মধুর—যখন দিবসের শেষে,
মল্লিকার দল ফুটে হেসে হেসে;
ধীর সমীরণ, পরিমল-ধন
করিয়া হরণ মাতিয়া বেড়ায়;
সুধা-গন্ধে তার জগত ক্ষেপায়।

৯

মধুর—যখন মৃদুল হিল্লোলে,
আদরিণী লতা মৃদু মৃদু দোলে;
সোহাগে মাতিয়া, পুলকে ভাসিয়া,
প্রিয় তরুবরে করে আলিঙ্গন,
গাঢ় প্রেমে তারে করয়ে বন্ধন।

১০

মধুর—যখন দূরাগত গান
বায়ু সনে আসি জুড়ায় পরাণ;
মধুর—আবার, পিকের ঝঙ্কার,
যবে ঋতুরাজ দেন দরশন,
ধরা ফুল সাজে সাজেন যখন।

১১

মধুর—যখন আকাশের কোলে,
সপ্ত বর্ণে সাজি রামধনু ঝোলে;
জলদের দল হাসে খল খল
বিদ্যুতের হাসি; সে রূপ নিরখি,
আপনি দিনেশ আত্ম-হারা—সুখী।

১২

মধুর বসন্তে, মধুর মলয়,
নয়ন-রঞ্জন রুচি কিশলয়,
মধুর—কেমন, ভ্রমরগুঞ্জন,
যবে ফুলেফুলে ফিরে অলিগণ ;
মধুর—কুসুম সৌরভমদন।

১৩

মধুর—যখন শরত আকাশে,
সাদা সাদা মেঘ দলে দলে ভাসে ;
মহীরুহগণ-পল্লব ভূষণ
পরিয়া কেমন সুষমা প্রকাশে ;
প্রকৃতি আপনি কত হাসি হাসে।

১৪

সরলতা-মাখা—প্রফুল্ল-আনন—
শিশুদের খেলা মধুর কেমন ?
কত আয়োজন,—ধূলার ব্যঞ্জন,
পুতুলের বিয়ে পুতুলের সনে,
তাতে কত সুখ সে পবিত্র মনে।

১৫

জননীর কোলে করিয়া শয়ন,
স্তন পান করে সন্তান যখন,
আপনা ভুলিয়া, সে মুখ চাহিয়া
থাকেন জননী—পুলকে মগন,
এ সরল ছবি মধুর কেমন ?

১৬

মার মুখ চাহি আধ আধ বোলে,
সুকুমার শিশু কত কথা বলে,
অর্থ বোধ তার করে সাধ্য কার,
কিন্তু মার প্রাণ গলে যায় তায়,
কি মধুর ভাব আছে সে ভাষায়।

১৭

মধুর—যখন বহুদিন পরে,
আইসে প্রবাসী আপনার ঘরে,
যেন বৃকলতা, সবে কয় কথা,
সবে যেন তারে সম্ভাষণ করে,
আনন্দের ঢেউ উথলে অন্তরে।

১৮

বহুদিন পরে প্রিয়ার বদন
হেরে আজ তৃপ্ত নাহি হয় মন ;
চারি চক্ষু স্থির, নিস্পন্দ শরীর,
মুখেতে কাহারো না সরে বচন,
মধুর—অশ্রুতে পূর্ণ দুনয়ন।

১৯

নয়নে নয়নে কত কথা হয়,
হৃদয়ে হৃদয়ে শত ভাবোদয়,
সে ভাব প্রকাশে, কথা নাহি আসে,
ভাষা আজি সেথা মানে পরাজয়,
হৃদয়ের ছবি নিরখে হৃদয়।

২০

জননীর কোলে শিশু সুকুমার
পিতার বদন হেরে বার বার ;
না চিনি তাঁহায়, নয়ন ফিরায়,
জননীর কোলে লুকায় বদন,
হেসে টিপি টিপি মধুর কেমন

২১

সে সুন্দর দৃশ্য করি দরশন,
উভয়েই তারে করেন চুম্বন
সে চুম্বনে মরি, হাসির লহরী
তুলি, সে নেহারে তাঁদের আনন,
মধুর এ ছবি—নয়ন-রঞ্জন।

২২

পাপের সন্তাপে করি হাহাকার,
কাঁদে যবে পাপী, হৃদয়-দুয়ার
করি উদ্ঘাটন ;—ঝরে দুনয়ন ;
ডাকে "দয়াময়—অধম-তারণ"
কি-মধুর তার অশ্রু বরষণ।

২৩

মধুর—যখন কর্ত্তব্য সাধিতে,
ত্যজে স্বার্থ নর হাসিতে হাসিতে ;
সংসার-বন্ধন—প্রিয় পরিজন
কেহই না পারে সে গতি রোধিতে,
ঢালে দেব-ভাব মানবের চিতে।

২৪

মধুর প্রেমের অদৃশ্য বন্ধনে,
বাঁধি চরাচরে, আপনার পানে
টানিছেন সবে যেই প্রেমময় ;
মধু হতে সুমধুর তাঁর নাম,
মধুর কণ্ঠেতে গাও অবিরাম।

ছোট নাগপুর বিভাগ ও তত্রত্য স্ত্রীশিক্ষা।

ছোট নাগপুর এক্ষণে বঙ্গ প্রদেশের একটী বিভাগ বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা নিয়ম বহিভূর্ত বিভাগ অর্থাৎ এক জন চিফ কমিসনর এখানকার শাসনকার্য্যের প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহা ৪টী জেলায় বিভক্ত—মানভূম, হাজারিবাগ, লোহারডগা এবং সিংহভূম। এই বিভাগের ভূমি পরিমাণ ২৭৫৪৯ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৩,৩৫,১৭৮, তন্মধ্যে ২১,৪৭,৮৬৬ জন পুরুষ ও ২১,৮৬,৩১২ জন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের পরিমাণ প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষের অপেক্ষা অধিক, এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ছোট নাগপুর এক্ষণে কয়েকটী কারণে সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথমতঃ ইহা খনিপ্রধান স্থান। এখানকার কয়লার খনি এক্ষণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কয়লা যোগাইতেছে এবং তাহা অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এখানে লৌহ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানকার প্রস্তর সকল দেখিলেই তাহাতে লৌহের চিহ্ন সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। এখানে তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্প্রতি বর্গণ্ডা নামক স্থানে একটী ইউরোপীয় কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ইতিমধ্যে ভূমি খনন করিয়া এক প্রকার খনিজ পদার্থ স্তূপাকার বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাম্রের ভাগ অধিক, রৌপ্য এবং কোবল্ট ধাতুও কতক পরিমাণে আছে। তাঁহারা কল বসাইয়া বহুল পরিমাণে তাম্র সংগ্রহ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ ছোট নাগপুরে অনেক মূল্যবান্

বৃক্ষের চাষ হইতেছে। এখানে শাল বৃক্ষ ত স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনেক বন আছে। কিছু দিন হইতে এখানে চা ও কফীর চাষ হইতেছে এবং যে চা ও কফী উৎপন্ন হইতেছে তাহা অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। এখানে অহিফেণ ও অন্যান্য দেশীয় কৃষিজাতেরও চাষ হয়। তৃতীয়তঃ এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। হাজারীবাগ, পচম্বা, গিরিদি ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কলিকাতার এত নিকটে এবং কলিকাতা হইতে এমন সুগম স্থানে এরূপ স্বাস্থ্যজনক স্থান আছে, পূর্ব্বে তাহা অবিদিত ছিল। ছোট নাগপুরে বাঙ্গালী, বিহারী ও উড়িয়া এই তিন জাতি ও অনেক মিশ্র হিন্দু জাতি বাস করে, এখানে মুসলমানের সংখ্যা কম। সাঁওতাল, কোল, ওরা-ওন প্রভৃতি ৯টী আদিম অসভ্যজাতি ভিন্ন ভিন্ন অংশে অল্পাধিক পরিমাণে বাস করিতেছে।

ছোট নাগপুরে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। এখানকার এমন অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান দেখা যায়, যাহারা যাবজ্জীবনে 'ক' অক্ষরটীও লিখিতে শিখে নাই। তবে স্থানে স্থানে গুরু-পাঠশালা কতক বর্ত্তমান ছিল। গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে গবর্ণ-মেণ্টের যত্ন ও উৎসাহে শিক্ষাবিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। তথাপি এখনও হাকিমদিগের ভয়ে বা অনুরোধ রক্ষার্থেই বাধ্য হইয়া অনেকে ছেলেকে লেখা পড়া শিখায়। এক ব্যক্তি বড় পুত্রটিকে পাঠশালে দিয়াছিল, আবার দ্বিতীয় পুত্রটিকে চাহিলে বলিল "এক ছেলেকে ত সরকারকে দিয়াছি, উহা দ্বারা আর আমার কোন উপকার হইবে না। আবার এটীকে দিতে পারি না।" ইহা দ্বারা বুঝা যায় শিক্ষার প্রতি ইহাদিগের অনুরাগ কত! যাহাহউক এখন এই বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭২৪ টী বিদ্যালয় হইয়াছে এবং তাহাতে ৫১৩৬৫টী ছাত্র পড়িতেছে। ইহার মধ্যে বালক ৪৬৭৩৮, বালিকা ৪৬২৭ জন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, গড়ে ৬ জন বালকের মধ্যে ১ জন বালক এবং ৭০ জন বালিকার মধ্যে ১ জন বালিকা লেখাপড়া করিতেছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে শিক্ষা পরিমাণ অধিক বটে, কিন্তু সংখ্যা পরিমাণ ইহার অপেক্ষা বড় অধিক হইবে না। ১৮৮৩-৮৪ সালে বালিকা-বিদ্যালয় ৪৯ টী ও ছাত্রীসংখ্যা ১৪৮২ ছিল, ১৮৮৪-৮৫ সালে বিদ্যালয় ৮০ এবং ছাত্রীসংখ্যা ২৬৩৮ হইয়াছে এবং বালক পাঠশালেও ১১৯১ বালিকার স্থলে ২০২৩ টী বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে, এরূপ উন্নতি যার পর নাই আশাকর সন্দেহ নাই। সিংহভূম জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীনাবস্থ, কিন্তু সেখানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ছোট নাগপুরে গত বৎসরে শতকরা ছাত্রীসংখ্যা যে ৭৪টী বৃদ্ধি

হইয়াছে, তন্মধ্যে একা সিংহভূমে ৪১ টী। সিংহভূমে গড়ে ১৪টী স্ত্রীলোকের ১টী বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে সিংহভূম বঙ্গদেশের উন্নত জেলা সকলের সমকক্ষ হইতেছে, ইহা কম আনন্দের বিষয় নহে। তত্রত্য ডেপুটী ইনস্পেক্টরের উৎসাহ ও যত্ন ইহার প্রধান কারণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আর সিংহভূম জেলার ডেপুটী কমিসনর মেজর গার্বেটও বিশেষ প্রশংসার্হ। ইনি শীতকালে যখন জেলা পরিদর্শনে বহির্গত হন, তখন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যালয়ের উৎসাহদান আপনার একটী বিশেষ কার্য্য বলিয়া গণনা করেন। গত বৎসরে নিজ হইতে ৬০০ টাকা পারিতোষিক ইত্যাদিতে দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ছাত্রীবৃত্তি সংস্থাপনার্থে ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন। সিংহভূমের অসভ্য কোল জাতির মধ্যেও কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি জাতিকে খৃষ্টান করিয়া পাদরীরা তাহাদিগের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি প্রদর্শন করিতেছেন।

গত বৎসর ছোট নাগপুরের উচ্চ প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৩ টী বালিকা উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে দুইটী উত্তীর্ণ হইয়াছে। চৈবাসা বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী বালকদিগের মধ্যেও অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একটী ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্ন প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১০ টী বিদ্যালয় হইতে ৫২ টী ছাত্রী উপস্থিত হয়, ৩৮টী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার মধ্যে সিংহভূমের ২৬টী বালিকা। ইহাদিগের মধ্যে ৪ জন এক একটী ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমুদ্রের গভীরতা।

পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে সমুদ্র অপার ও অতলস্পর্শ অর্থাৎ সমুদ্রের পারও নাই এবং তাহার তলদেশ কখনও স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু এখন সমুদ্র পার হইয়া লোকে নানাদেশে ভ্রমণ করিতেছে, এক স্থান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে আসিতেছে। সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা কত, তাহাও মাপিয়া ঠিক করা হইতেছে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশের ন্যায় সমুদ্রতলেরও ছবি লইবার কৌশল বাহির হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের গভীরতম গর্ভে জীবজন্তু ও উদ্ভিদ কিরূপ অবস্থায় থাকে, সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে।

সমুদ্রের গভীরতা নিরূপণ করিবার

জন্য তিন প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ঃ— (১) মানরজ্জু, (২) ড্রেজ (Dradge) বা জালযন্ত্র, (৩) তাপমান যন্ত্র। মানরজ্জুর মুখে সিসার চাপ বাঁধা থাকে এবং সিসার তলায় চর্ব্বি বা আটা সংলগ্ন থাকে। রজ্জু জাহাজ হইতে জলে নামাইয়া দিয়া যতদূর মগ্ন হয়, তাহার মাপ লিখিয়া রাখা হয় এবং সিসা যেখানে বাধা পায়, সেখান হইতে তাহাকে তুলিয়া দেখা হয়, তাহাতে কিরূপ মৃত্তিকা বা বালুকা সংলগ্ন হইয়াছে। জালযন্ত্র একটী লোহার ফ্রেমে জাল বা থলিয়া দিয়া প্রস্তুত, ইহাদ্বারা তলার মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে উত্তোলিত হয় এবং সমুদ্রতলস্থ জীবিত বা মৃত জন্তু ও উদ্ভিদও উত্তোলন করা যায়। তাপমান যন্ত্র দ্বারা সমুদ্রের গভীর হইতে গভীরতর স্থানের উত্তাপের পরিমাণ সহজে নির্দ্দেশ করা যায়।

সকল সমুদ্রেরই গভীরতা অল্পাধিক পরীক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের যেরূপ সর্ব্বতোভাবে হইয়াছে, এরূপ আর কাহারও নহে। আট্‌লাণ্টিক প্রশান্ত মহাসাগর অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর হইলেও দৈর্ঘ্যে তাহার অপেক্ষা বড়। ইহার বিস্তার পরিমাণ ৩৫,১৬৫,০০০ মাইল অর্থাৎ সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রায় পঞ্চমাংশ। কিন্তু আটলাণ্টিকের উপরিভাগ যেরূপ প্রশস্ত, তলদেশ সেরূপ নহে। উত্তর আটলাণ্টিকে আজোর্স, বার্মুডাস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আট-লাণ্টিকে সেণ্টপল, সেণ্টহেলেনা, আসেনসন প্রভৃতি দ্বীপ সমুদ্র গর্ভ যে স্ফীত ও উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ হইতে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ আটলাণ্টিকের গভীরতা মাপিবার জন্য অনেকগুলি জাহাজ নিযুক্ত করেন। এই মাপের ফল যাহা হইয়াছে, বিবৃত হইতেছে। ১৮ হাজার ফিটের অধিক গভীরতা অল্প স্থানেই দৃষ্ট হইয়াছে। সেণ্টটমাস দ্বীপের ১০০ মাইল উত্তরে যে মাপ হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ এই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ২৩২৩০ ফিট বা ৪॥ মাইলেরও অধিক দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ২৯ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ, সুতরাং আট-লাণ্টিকের গভীরতম তল গভীরতায় তদপেক্ষায় অনেক কম। আটলাণ্টিকের প্রশস্ততর ভাগের গভীরতা ২ হইতে ৩৸ মাইল মাত্র। ব্রিটিষ দ্বীপপুঞ্জের ২৩০ মাইল দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রতল অল্পে অল্পে গড়ানে হইয়া গিয়াছে, এক মাইলে ৬ ফিটের অধিক নিম্ন হইবে না। কিন্তু তৎপরে ২০ মাইলে তলদেশ ৯০০০ ফিট নীচু হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রতল এক সমান হইয়া প্রসারিত আছে। আটলাণ্টিকের গর্ভ অনেক স্থানে আলির মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে,

আজোর্স দ্বীপপুঞ্জ তদংশে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ।

প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপমালা আরও অধিক এবং ইহার তলদেশ অসমান। ইহারও অনেক স্থলের গভীরতা আটলান্টিকের মত ২ হইতে ৩॥ মাইলের অধিক নহে। কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহা আটলান্টিককে হারাইয়াছে। চ্যালেঞ্জার জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগর বহিয়া যায়, তখন জাপান ও আড্মিরালটী দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাপ লওয়া হয়। এই মাপ ২৩৮৫০ ফিট অর্থাৎ ৫ মাইলের অধিক হইয়াছিল, আর এক স্থানের গভীরতা ৪। মাইল দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, হইলে বোধ হয় আরও অধিক পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

আবিয়ারের উপদেশ। *

১। স্ত্রীলোকের লজ্জাই পরম ভূষণ।

২। অসতের সম্পত্তি অসৎ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

৩। অত্যন্ত দরিদ্র হইয়াও সৎকার্য্যে বিরত হইবে না।

৪। পরিজনের নিকটেও অশিষ্ট হইয়া কথা কহিও না।

৫। দীন দুঃখীর প্রতি সদয়ভাবে কথা কহিবে।

৬। যে পরচ্ছিদ্র অন্বেষণ করে সে সর্ব্বত্রই দোষ দেখিতে পায়।

৭। প্রতিফল দেওয়া অপেক্ষা ক্ষমা করা ভাল।

৮। ঐক্যই সার পারিবারিক ভূষণ।

৯। রিপুর প্রশ্রয়ে গুণরাশি নষ্ট হয়।

১০। বিবাদ ও জুয়াখেলা দুঃখ আনয়ন করে।

১১। পিতামাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচিত দেবতা।

১২। শয়নেরও নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিও।

১৩। দুষ্টা ভার্য্যা ক্রোড়স্থ অনল সদৃশ।

১৪। কুৎসাকারিণী স্ত্রী প্রেতযোনি সদৃশ।

১৫। ভিক্ষা অপেক্ষা কঠিন পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভাল।

---

* আবিয়ারের জীবনী ও উপদেশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সমুদায় উপদেশগুলি আর বামাবোধিনীতে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না। পাঠিকাগণ পুস্তক খানি হইতে উপদেশগুলি পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারিবেন।—বা, বো, স।

১৬। নিষ্কলঙ্ক বিবেক ব্যতীত সুনিদ্রা হয় না।

১৭। যে ব্যক্তি মনে যেমন ভাবে বাক্যে সেইরূপ বলে, সেই ব্যক্তিই সাধু।

১৮। মিথ্যা কথা আর নরহত্যা ও চৌর্য্যবৃত্তি উভয়ই সমান।

১৯। নম্র স্বভাব স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য।

২০। অজ্ঞ লোকেই অন্যের তোষামোদ করে।

স্পার্টীয় রমণী।

পাঠিকা! তোমরা স্ত্রীলোক। স্বজাতি প্রসঙ্গে তোমাদের কৌতূহল জন্মিবে, তাই স্পার্টীয় রমণীর গল্প পাড়িলাম। যদি তোমাদের প্রীতিপ্রদ হয় তবে আকাঙ্ক্ষা রহিল পুরাকালীয় আরও দু এক জাতির ভামিনীদিগের কথা তুলিব।

স্পার্টা ও এথেন্সের নাম অবশ্যই তোমাদের শোনা আছে। এথেন্স উত্তর গ্রীসের রাজধানী। অধুনা গ্রীসের যে অংশকে মোরিয়া কহে, পুরাকালে তাহাই পিলপনিসস নামে অভিহিত ছিল। স্পার্টা তাহারই রাজধানী। যখন ইটালীতে রোম জন্মে নাই, যখন আফ্রিকায় কার্থেজ অতি শিশু, সেই অতি প্রাচীন কালে গ্রীসে স্পার্টা ও এথেন্সের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। বিপুল ঐশ্বর্য্যে ও প্রভূত পরাক্রমে স্পার্টীয় ও এথেনীয়গণ পরস্পর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এথেনীয় ও স্পার্টীয় রমণীর বৈষম্য বিস্তর; দিবাতে ও যামিনীতে অথবা তোমাতে ও ইংরেজ রমণীতে যত তারতম্য, স্পার্টীয় ও এথেনীয় কামিনীর পার্থক্য ততোধিক। তোমাদের স্বাভাবিক আইনে বলে না, তোমরা ঘরে বসিয়া থাক এবং অবগুণ্ঠনে মুখ-শশী ঢাকিয়া রাখ; অথবা তোমরা বসনে কটি বাঁধিয়া, কাঁচলি আঁটিয়া মুদ্গর ভাঁজ। কিন্তু এথেন্স ও স্পার্টার আইনে তাদৃশ বিধি ছিল। তোমাদের আইন বে-আইন তোমাদের পিতা স্বামী ও পুত্রের হস্তে; কিন্তু তাহাদের বিধি অবিধি রাজপুরুষদের হস্তে। এথেনীয় রমণী উপভুক্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করিল, তাই নীতি-বিশারদ জ্ঞানী সোলন স্বকৃত সংহিতায় স্ত্রী-স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ব্যবস্থা হইল রমণীগণ দিবসে ত্রয়োধিক বার বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরের বাহির হইতে পারিবে না এবং বহির্গমনকালে তাহাদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রব্যজাত থাকিবে না। যামিনীযোগে ভামিনীগণের রাজপথে ভ্রমণ নিষেধ—তবে পারিবে যদি

শকটারোহণে হয়, আর আলো সম্মুখে থাকে। মৃতের সমাধিকালে সুর ধরিয়া একঘেয়ে উচ্চ কান্না আইন-বিরুদ্ধ। সোলনের ঈদৃশ বিধি কেবল খাতাপত্রগত নহে, কিন্তু উহা প্রতি-পালিত হয়, তজ্জন্য কর্ম্মচারী ও নিযুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু স্পার্টা নগরীতে মহাত্মা লাই-করগাস প্রবর্ত্তিত বিধি সম্পূর্ণ বিপরীত। সোলনের আজ্ঞা, হে ভগিনীগণ! তোমরা পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী হও, পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিও না। লাইকরগাসের ব্যবস্থা, হে সুন্দরীগণ! তোমরা বীরকন্যা, বীরভার্য্যা ও বীর-মাতা হও; ঘোমটা টানিয়া ঘরে বসিয়া থাকিয়া শরীরটাকে মাটী করিও না। তাঁহার সংহিতায় শিক্ষা ও শাসনের কঠোরতা সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষে বৈষম্য নাই; সাধারণ বিধি ও বিশেষ বিধি নাই; আমি অবলা তুমি সবলা, ঈদৃশ তারতম্য নাই। সকলেই সবল সকলেই প্রবল। "স্ত্রী" অর্থে অবলা শব্দ স্পার্টার অভি-ধানে নাই। স্পার্টার অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্রে আগাছা ও অসার বৃক্ষের একান্ত স্থানা-ভাব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পরী-ক্ষিত হইত। পরীক্ষায় ক্ষীণাঙ্গ, কাণা, খোঁড়া, বিকল বা ভবিষ্যৎ কঠোর ও কষ্টসহ জীবনের অনুপযোগী বিবেচিত হইলে, নবপ্রসূত সন্তান টেগিটাস শৈলগুহায় নিক্ষিপ্ত হইত। সপ্ত বর্ষ কাল মাতৃক্রোড়ে পালিত হইয়া মায়ের সন্তান আর মায়ের রহিল না; অমনি শিক্ষার্থে রাজপুরুষ-দিগের হস্তে ন্যস্ত হইল। তোমরা স্ব স্ব পরিবারের এক আধ জন বট; সমাজেরও কেহ নও, রাজ্যেরও কেহ নও। কিন্তু স্পার্টীয় রমণী কি পরিবার, কি সমাজ, কি রাজ্য, এ সকলেরই অন্তর্নিবিষ্ট। তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য ও উদ্দেশ্যের চরম রান্না, বাড়া, ঢালা, ঝাড়া নহে, কিন্তু বীরভোগ্য স্পার্টা নগরীর জন্য বীর সন্ততি প্রসবন। তাই তাহারা অবলা হইয়া সবলা হইবার অভিপ্রায়ে অঙ্গ সঞ্চালন, মল্লযুদ্ধ, প্রধাবন ও উল্লম্ফন প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিত—কেবল সুখের জন্য নহে, না করিলে দণ্ডনীয় হইত। ঈদৃশ ক্রীড়াস্থলে যুবকবৃন্দের উপস্থিতি নিষিদ্ধ ছিল না। তেমনি আবার যুবাবৃন্দের ক্রীড়াদর্শনে কুমারীগণের আপত্তি ছিল না। সুতরাং স্পার্টীয় স্ত্রী পুরুষে যতদূর মেশামিশি আলাপ আলোচনা চলিত, জগতে কুত্রাপি তেমন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এতাদৃশী প্রথা যে কুফলের প্রসূতি হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। গ্রীসের অপরাপর ভামিনীগণ অপেক্ষা স্পার্টীয় রমণী সহস্র গুণে সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। স্পার্টীয় রমণী সচরাচর বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পরিণীত হইত। উদ্বাহের পর আর তাহাকে প্রকাশ্যে সাধারণ শিক্ষার

অধীন হইতে হইত না। স্বামী তাহাকে প্রেম করিতেন ও সম্মান করিতেন এবং যথোচিত স্বাধীনতা প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাই তাহার স্বদেশের মঙ্গলে ও গৌরবে অতৃপ্ত পিপাসা। তাই তাহার হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে স্বদেশ-বৎসলতার রশ্মি প্রদীপ্ত ও চির-উদ্ভাসিত। স্পার্টীয় মাতা আত্ম-গৌরবে ও বীরশ্রেষ্ঠ আত্ম-সন্তানের গৌরবে গৌরবান্বিতা। কোন বিদেশীয় রমণী স্পার্টারাজ লিয়নিডাসের পত্নী গর্গকে বলিয়াছিলেন "কেবল স্পার্টীয় রমণীই পুরুষ শাসনে সক্ষম''। গর্গ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "কেবল স্পার্টীয় রমণীই পুরুষ প্রসবনে সমর্থ।" শূরোচিত কার্য্যে রমণীগণের অক্লান্ত সহানুভূতি ও প্ররোচনায় তাহাদের স্বামী ও পুত্রগণের হৃদয়ে অনন্ত উৎসাহ স্বতঃ উদ্ভূত হইত। গৃহে জননী ও ভার্য্যার তীব্র ভর্ৎসনা ও অপরিসীম ঘৃণার অসহ্য দংশন আশঙ্কায় স্পার্টীয় যুবক সমরাঙ্গনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা রণ-পয়োধির উত্তাল তরঙ্গে নশ্বর দেহ বিসর্জন শ্রেয়ঃ ও শ্লাঘা জ্ঞান করিত। যুদ্ধযাত্রাকালে মাতা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন "সফলক হস্তে অথবা ফলক শয্যায় শয়ান হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিও", অর্থাৎ হয় জয়লাভ করিয়া, নয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া আসিও। লিউক্‌ট্রার * শোচনীয় সমরে যাহাদের দেহপাত হইয়াছিল তাহাদের প্রসূতি-গণ সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়াছিল। আর যাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদের জননীগণের শোক ও পরিতাপের পরিসীমা ছিল না। কেহ স্ব-পুত্র নিধনে সুখিনী, কেহ বা পুত্রের জীবন রক্ষায় বিষাদিনী। স্পার্টীয় রমণী সম্মুখ সমরে পুত্রের নিধনবার্ত্তা কিরূপ অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করিতেন এবং পুত্র ভীরু ও কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ পরিহার করিলে, তাঁহার রোষানল কি প্রকার উদ্দীপ্ত হইত, নিম্ন-প্রকটিত দুইটি কবিতা দেখিলে তাহা পাঠিকাগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১

রাখিতে অটুট স্বদেশ-সম্মান,
বীর-প্রসবিনী ডিমিনিটা নাম,
প্রেষিলা সমরে,
আনন্দ অন্তরে,
আটটী সন্তান।
একই সমাধি গ্রাসিল সবায়;
ফেলিল না মাতা অশ্রুকণা তায়;
কহিলা গরবে,
"প্রসবিনু সবে,
মরিতে হে স্পার্টা! তোমারি সেবায়।

২

দুইটী স্পার্টীয় শূরশ্রেষ্ঠ প্রধান;
সম্মুখ সমরে করিল পয়ান।

* এই যুদ্ধ স্পার্টা ও থিব্‌স নগরের মধ্যে হয়। স্পার্টীয়গণ পরাভূত হয়।

একটী নিহত ;
গৃহে প্রত্যাগত,
নিরখি অপরে,
জ্বলিলা জননী কৃশানু সমান।

প্রহারে অমনি বধিলা সন্তান।
স্পার্টা য় জননী খ্যাত চরাচরে,
জড়পিণ্ড কভু ধরে না জঠরে।

ভগিনীর প্রতি উপদেশ।

১ম পত্র।

স্নেহের ভগিনি! শুনিলাম তুমি একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ। তোমার স্বামীর এ বিষয়ে মত নাই, তবুও তুমি ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছ। কে তোমাকে এ বুদ্ধি দিল? ইহা যে নিতান্ত ভ্রমবুদ্ধি তাহা বুঝাইবার জন্য তোমাকে এই পত্রখানি লিখিলাম, ভ্রমের কার্য্য করিবার পূর্ব্বে একবার ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে, কারণ কোন কাজ করিয়া ভাবা অপেক্ষা ভাবিয়া করাই ভাল।

১। ঈশ্বর তোমাদিগকে সন্তান-রত্ন দেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু দত্তক সন্তান লইয়া কি পেটের সন্তানের অভাব পূর্ণ করিতে পার? দুধের তৃষ্ণা ঘোলে যায় না, দত্তক সন্তান দ্বারাও অপত্যস্নেহ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। তুমি জান, সে তোমার পুত্র নয়, তাকে আপনার পুত্র প্রাণের সহিত বলিতে পারিবে না; সেও যখন বুঝিবে, তুমি তাহার গর্ভধারিণী মাতা নও, তাহার মাতা পিতা অন্য জন, তখন সেও তোমাকে পর বলিয়া ভাবিবে, তোমার স্বামীকে পিতৃভক্তি দিতে সঙ্কুচিত হইবে। আর পালন করিয়া স্নেহানুরোধে যদি তোমরা তাকে আপনার বল সে কখনও তোমাদিগকে আপনার মনে করিবে না, বরং অস্বাভাবিক সম্বন্ধে তোমরা তাহাকে বদ্ধ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হইবে। সেরূপ সন্তান তোমাদিগের কোন্ কাজে লাগিবে?

২। সচরাচর দত্তক সন্তান কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে শিক্ষালাভ করিতে পার। পোষ্য পুত্র বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহাদিগের অধিকাংশ অপব্যয়ী, দুশ্চরিত্র এবং আত্মীয়, স্বজন ও সমাজের অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক জনের বহু কষ্টের উপার্জিত বিষয় ও সঞ্চিত ধন যদি বিনা পরিশ্রমে আমার হস্তগত হয় আর সেই লোকের প্রতি আমার প্রাণের

মায়া না থাকে, তাহার অর্থের প্রতি আমার মায়া হইবে কেন? যৌবনকালে যখন নানা প্রবৃত্তির তরঙ্গ প্রাণের মধ্যে খেলিতে থাকে, যখন আমোদপ্রিয় বয়স্কসকল গ্রীষ্মকালীন **মক্ষিকার** ন্যায় পালে পালে চারিদিক ঘেরিয়া বসে, তখন যত প্রচুর অর্থ হস্তে থাকুক না কেন, তাহা উড়াইতে কতক্ষণ লাগে? আমাদিগের দেশে যে হঠাৎ বাবুর দল দৃষ্ট হয়, এই পোষ্য পুত্র শ্রেণী হইতে কি তাহারা উৎপন্ন হয় না? যত প্রকারে যথেচ্ছাচার ও অর্থের অপব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহারা তাহার আদর্শ। ইহাদের প্রতি সাধারণ লোকের স্নেহ ও সহানুভূতি থাকে না, সুতরাং সাধারণের প্রতিও ইহাদিগের সহানুভূতি হয় না, প্রত্যুত উভয় পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদয় হইয়া থাকে। সাধারণে ইহাদিগকে বিদ্রূপ, পরিহাস ও নিন্দা করে। অর্থবলে গর্ব্বিত হইয়া ইহারা সাধারণের মত কি প্রকারে পাদদলিত করিতে হয় এবং তাহাদিগকে কি প্রকারে জব্দ করিতে হয়, আপনাদিগের চরিত্র দ্বারা তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। পোষ্য পুত্র সৃষ্টি দ্বারা এইরূপে ধনীর ধন অচিরে নিঃশেষিত হয় এবং সমাজমধ্যে ঘোরতর বিবাদ ও বিপ্লব উপস্থিত হয়। পোষ্য পুত্রের বিপদ পিতাকে বড় সহ্য করিতে হয় না, কারণ, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই প্রায় তিনি লোকান্তরিত হন, কিন্তু তাহার জন্য মাতাকে সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত থাকিতে হয় এবং কত সময় ঘোরতর বিপদাপন্ন হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এরূপ পুত্র কি কলঙ্ক ও যন্ত্রণার কারণ নহে? দত্তক পুত্রগণের মধ্যে যে দুই একটী রত্ন না মিলে এমত নহে, কিন্তু তাহা অতি বিরল ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। দস্যু, তস্কর প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যখন সৎপ্রকৃতি লোক পাওয়া যায়, তখন ইহাদিগের মধ্যেও যে পাওয়া যাইবে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহার আশা করা যায় না। ভগিনি! তোমার ভাগ্যে যে সন্তান আশানুরূপ হইবে, তাহার নিশ্চয় কি?

৩। তোমাদিগের কিছু ধনসম্পত্তি আছে মনে করিতেছ, পোষ্য পুত্র না হইলে কে ভোগ করিবে? অর্থের দুই প্রকারে উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে, এক ভোগের দ্বারা, ২য় ত্যাগের দ্বারা। ঈশ্বর আমাদিগকে যে ধন দিয়াছেন, তাহা যতটুকু আমাদিগের নিজের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন, তাহা আমরা ভোগ করিব। ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহাদ্বারা জগতের কল্যাণ ও অন্যের উপকার সাধনের চেষ্টা করিব। তোমার অর্থ দ্বারা যদি ১০টী বিধবা, কি অনাথ বালক বালিকা বা দরিদ্র লোককে প্রতিপালন করিতে পার, তাহা হইলে সে অর্থ কি সার্থক হয় না? তোমার অর্থ দ্বারা যদি ৫টী নিরুপায় বালকের পাঠের সাহায্য কর, ১০টী রুগ্ন